বর্ষ ২১ ॥ সংখ্যা ২২ ॥ ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ॥ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯৪

পশ্চিমবঙ্গ





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

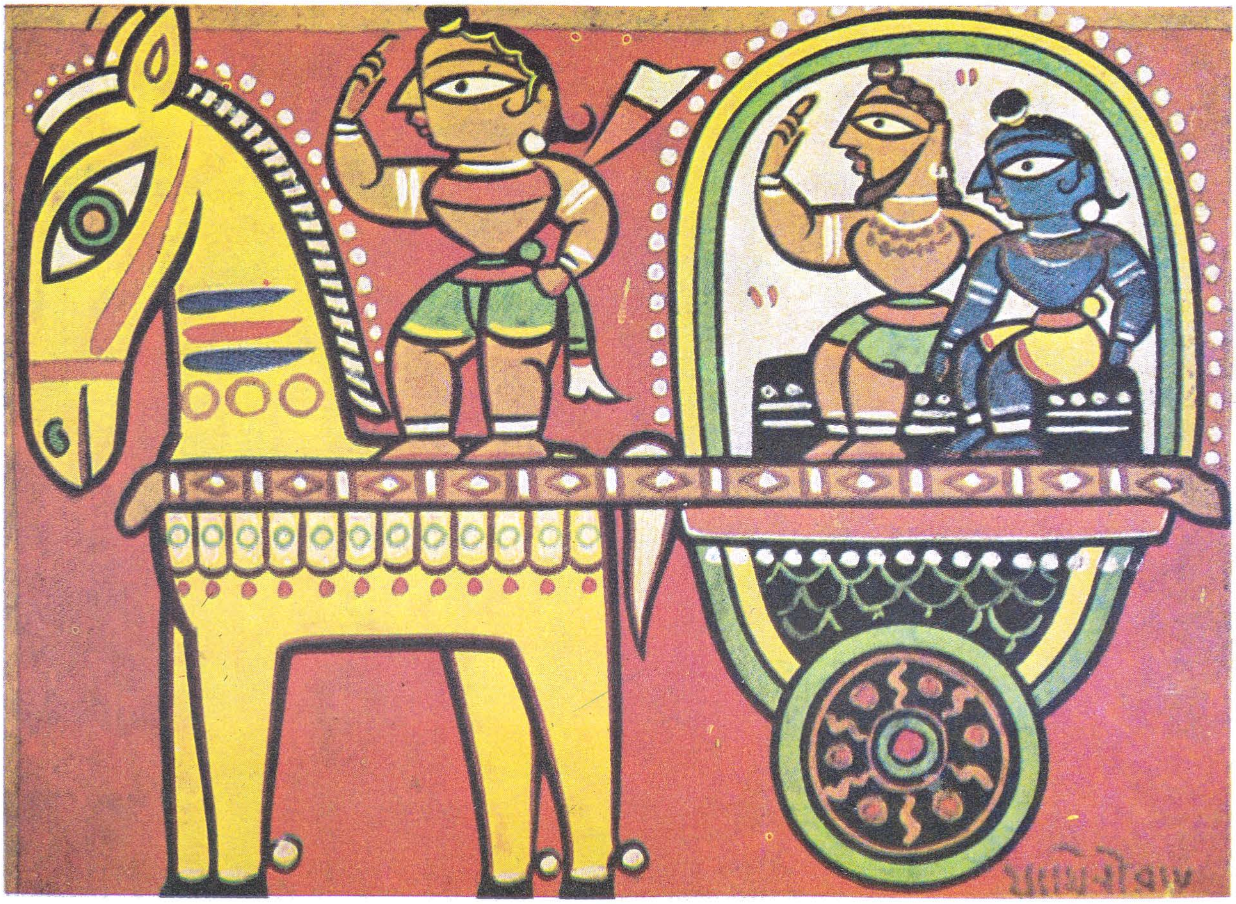
স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



পশ্চিমবঙ্গ

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রধান সম্পাদক

প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : ধীরেন্দ্র দত্ত

অলংকরণ : রণেন মুখোপাধ্যায় ও

সমরেশ মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচি

প্রচ্ছদ, দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ও চতুর্থ প্রচ্ছদ—যামিনী রায়ের চিত্রকলা

এই সংখ্যার দাম ৫০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২১ ।। সংখ্যা ২২ ।। ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ।। ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯৪

যোজনার বর্তমান ধাঁচ এবং রাজস্ব ব্যবস্থার বেশ বড় রকমের পরিবর্তন জরুরি —মুখ্যমন্ত্রী

দেশের ঐক্য এবং সংহতির ধ্যানধ্যারণাকে যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে যোজনার বর্তমান ধাঁচ এবং রাজস্ব ব্যবস্থার বেশ বড় রকমের পরিবর্তন জরুরি। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন সম্পদ সংগ্রহ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়টির বিকেন্দ্রীকরণ।

৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ হায়দ্রাবাদে অ্যাডমিনিসট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই নতুন করে ঢেলে সাজানো যোজনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনার বিষয়টি অবশ্যই বিভিন্ন পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত হবে যেমন, কেন্দ্র থেকে রাজ্য, জেলা, ব্লক ও গ্রাম স্তরে। আর সব স্তরেই পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব দিতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংস্থাগুলির উপর। একইরকমভাবে অর্থনৈতিক সম্পদেরও বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই রাখতে হবে।

শ্রীবসু বলেন, বর্তমানে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভবনের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঝুঁকে পড়ায় রাজ্যগুলির মধ্যে সুস্থ সুসমন্বিত সম্পর্ক রক্ষার মত প্রশ্নগুলিকে দারুণভাবে অবহেলা করে যাচ্ছে। পরিকল্পনা পদ্ধতির জাতীয় স্তরে সমন্বয়ের অভাবের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে অনেক সময় রাজ্যগুলি কর চাপানোর ব্যাপারে নিজেদের মধ্যেই দুর্ভাগ্যজনক রেষারেষির শিকার হন। রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কার্যকর অন্তঃসম্পর্ক বজায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার এটি একটি নিদর্শন। জাতীয় পরিকল্পনা তার গুরুত্ব অনেকটাই হারাবে যদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব রাজ্যগুলি সমানভাবে না পায় অথবা কয়েকটি রাজ্য তাদের প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী সমদরে পাচ্ছে কিন্তু অন্য কিছু রাজ্য তাদের প্রয়োজনের সামগ্রীর ক্ষেত্রে সেই সমদরের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এইজন্যে আমরা খাদ্যসামগ্রীসহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, শিল্প সামগ্রী ইত্যাদি সমদরে সারা দেশের সর্বত্র কেন্দ্রকর্তৃক বিলি করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে আসছি।

শ্রীবসু তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সহযোগিতার অভাবের অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহানার জন্য হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের মতো অনেক রাজ্য প্রকল্প ঝুলে রয়েছে।

তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল—ভারতে যোজনার ক্ষেত্রে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা। এই ভাষণে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়া গেলেও গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উৎপাদন অনেক চাঙ্গা হয়েছে।

তিনি বলেন, যোজনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যা দৃষ্টিভঙ্গি তাতে পুরো দেশটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঋণ-ফাঁদে। বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো এবং কেন্দ্রের সহানুভূতিতে ঘাটতি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার উৎপাদন সম্পদের সুষম বন্টন, কার্যকর ভূমি-সংস্কার ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দান ইত্যাদি ব্যাপারে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলন হায়দরাবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীবসু বলেন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে কংগ্রেস (আই)-র বিকল্প সম্ভব দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে, কোন রাজনৈতিক দল এককভাবে বিকল্প সরকার গঠন করতে এখন পারবে না। বিভিন্ন রাজ্যেও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। সেজন্য বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই ঐক্য নির্বাচনের জন্য জনগণের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য।

পঞ্জাব পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীবসু বলেন, বার্নালা সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার অপসারণ করেছে রাজনৈতিক কারণে। এরপর রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হলেও অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। পঞ্জাব সমস্যার সমাধান করতে হলে শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে হবে না, নির্বাচিত সরকারের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও নেওয়া প্রয়োজন। দার্জিলিঙ প্রসঙ্গে শ্রীবসু বলেন, প্রস্তাবিত দার্জিলিঙ পার্বত্য পরিষদ সম্পর্কে কেন্দ্রকে সম্মতি জানিয়ে এসেছিল জি এন এল এফ, পরে তারা মত পরিবর্তন করে নতুন দাবি পেশ করে। যেমন নতুন এলাকা এই পরিষদে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু সেইসব এলাকায় ৯২ শতাংশ মানুষ অনেপালী। কেন্দ্র ও রাজ্য এখন একমত হয়েছে যে, নতুন কোন দাবি মেনে নেওয়া হবে না। শ্রীঘিসিঙ এ ব্যাপারে জি এন এল এফ-র মত জানাতে কয়েকদিন সময় চেয়েছিল।

দিল্লিতে ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা '৮৭

গত ১৪ থেকে ২৯ নভেম্বর নয়াদিল্লীর প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা '৮৭। এ মেলায় পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপসজ্জায়, তার নিজস্বতা ও সারল্যের নিখুঁত সংমিশ্রণে।

রাজ্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ ও হস্তশিল্পের মোট ২৪টি ইউনিট এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগৃহীত পশ্চিমবঙ্গ শিল্প বিকাশ নিগম ও পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক শিল্প বিকাশ নিগম এই মেলায় তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই মন্ডপে। কেন্দ্রীয় সরকারি একটি সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস্ এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপের অংশীদার হয়েছে। থিওডোলাইট থেকে অত্যাধুনিক ক্যামেরা এবং বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছে রেমিংটন র‍্যান্ড, ডানলপ ও ইন্ডিয়া লিনোলিয়াম।

পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী মুদ্রা আমদানির দু'টি প্রধান সূত্র—পাট ও চা-এর প্রতিনিধিত্ব করেছে গুডরিক গ্রুপ ও নওদা মিল। জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের স্টলটি তাদের পাটজাত বিচিত্র দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে দর্শকদের আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের ব্যানারের নীচে অংশ নিয়েছে প্রায় ৭০টি সাহায্যপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা। এদের বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অগ্রগতির একটি রেখাচিত্র উপস্থিত করেছে।

এ বছরের নির্বাচিত বিষয়গুলির অন্যতম 'হস্তশিল্প'-এর উপর এবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রথাগত তাঁতশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে তন্তুজ, তন্তুশ্রী, মঞ্জুষা, গ্রামীণ, চর্মজ ইত্যাদি এবং আরও কিছু নতুন বিপণি এবার দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি লোকশিল্পের বিপণিতে স্থান পেয়েছে ঐতিহ্যশালী বিচিত্র সব নক্‌সীকাঁথা। একজন পটুয়া মেলায় বসেই কালিঘাটের পট এঁকে দিচ্ছেন। বঙ্গশ্রীতে স্থান পেয়েছে বহু বিচিত্র হস্তশিল্প সামগ্রী।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় 'অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভান্ডার'-এর, বাঙলার মিষ্টান্নের পসরা এই প্রতিষ্ঠানটি সকলেরই রসমধুর আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে পাওয়া গেছে দিল্লি অফিসের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তথ্যচিত্রগুলি।

যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনীটি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন তাদের মধ্যে আছেন—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই.কে. নায়নার, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।



ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ডপের ভেতরের আংশিক চিত্র

রাজ্যের ধানকাটা মরশুম ও আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য প্রশাসনিক কঠোর ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

মহাকরণের রোটান্ডার ৩০ নভেম্বর ১৯৮৭ তে জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের সংগে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু চলতি ধানকাটা মরশুম ও আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয় সেজন্য পুলিস ও জেলা প্রশাসনকে সবসময় সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন

প্রতিবছর ধানকাটা মরশুমে যে সংঘর্ষ হয় তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এর সংগে রাজ্যের আইন শৃংখলার প্রশ্নটি ও জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ করে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জেলাপ্রশাসনকে জোর করে ধানকাটার ঘটনার ব্যাপারে এবছর বিশেষভাবে সতর্ক থাকার জন্য পরামর্শ দেন। এ প্রসংগে তিনি আরো বলেন যে শুধু পুলিশ দিয়ে বা গুলি চালিয়ে কাজ হবে না, ধানকাটা মরশুমে যাতে কোন অশান্তি বা গন্ডগোল না হয় সেজন্য জেলাপ্রশাসনকে জেলার কৃষক সমিতির সংগে যোগাযোগ রাখতে হবে, তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খবরাখবর নিতে হবে। কিন্তু জোর করে ধানকাটার মত কোন বে আইনী ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে সংগে সংগে কঠোর ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সমস্ত জেলা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে পরিষ্কার নির্দেশ দেন।

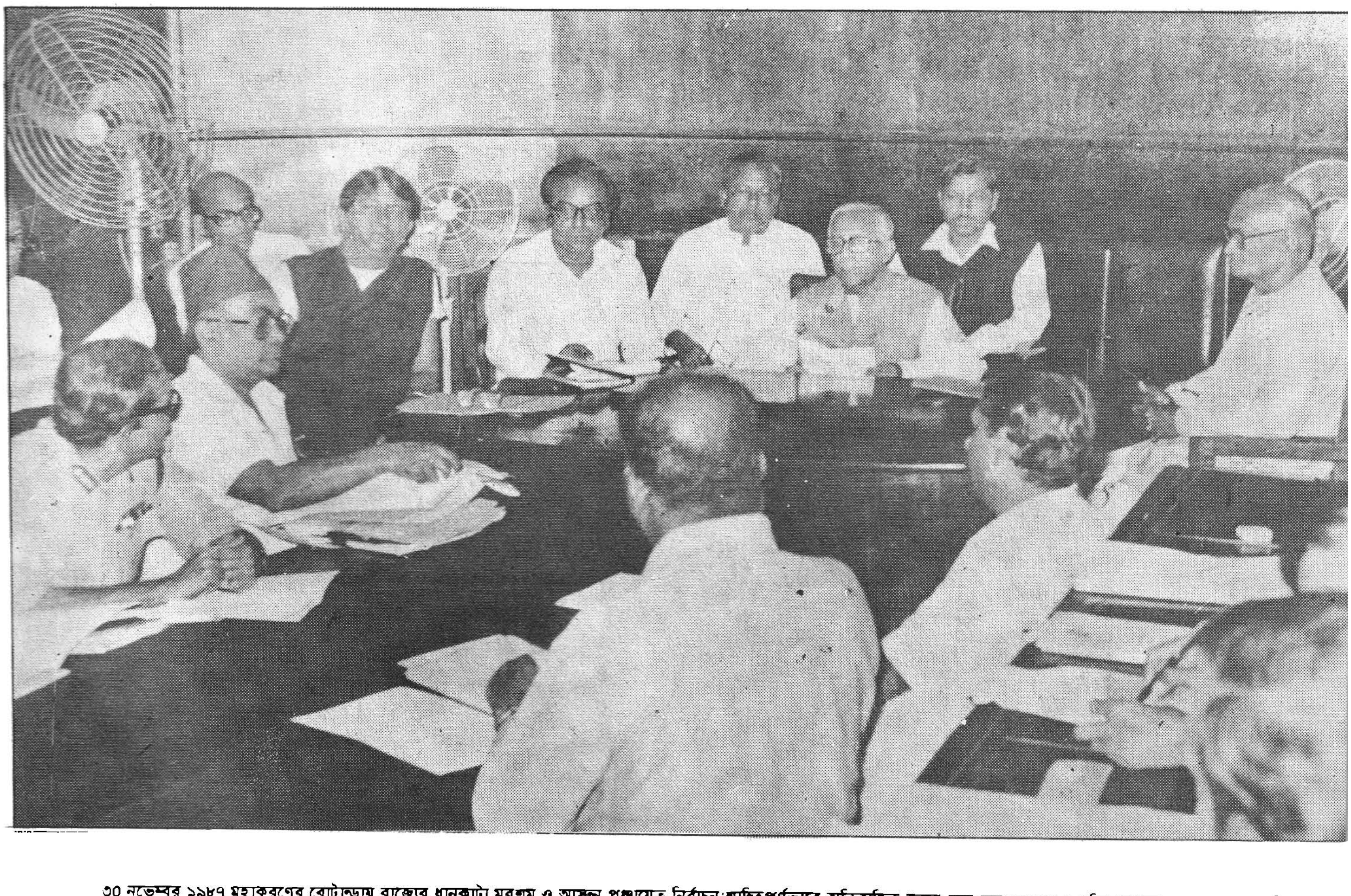
ধানকাটা মরশুমে জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষায় পুলিসবাহিনী মোতায়েন করার প্রসংগে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে সমস্ত ঘটনার জন্য আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য জেলা প্রশাসনকে সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে নির্দেশ দেন।

বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতার প্রসংগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এখন অবধি খবর তা হল কেরোসিন যথেষ্ট আছে। রেশনদোকান মারফৎ কতগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিলি ব্যবস্থার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন।

বন্যাত্রাণের কাজের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে কেন্দ্রের কাছ থেকে এ বাবদ পুরো টাকা এখনো মেলেনি, তবে ত্রাণকার্য থেমে নেই, আমাদের বাজেট থেকে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই বৈঠকে ভূমি ভূমিসংস্কার মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন।



৩০ নভেম্বর ১৯৮৭ মহাকরণের রোটান্ডায় রাজ্যের ধানকাটা মরশুম ও আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের সংগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (মুখ্যমন্ত্রীর বামে) অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত (মুখ্যমন্ত্রীর ডানদিকে) এবং মুখ্য সচিব শ্রীরথীন সেনগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন।

ছবি : সুমন্ত পত্রনবীশ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী উপলক্ষে শিশিরমঞ্চে অনুষ্ঠান

৩০ নভেম্বর ১৯৮৭ শিশির মঞ্চে পশ্চিমবংগ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলা আকাদেমির সভাপতি শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। তিনি তাঁর ভাষণে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য কৃতির মূল্যায়ন করেন। কবির সংগে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুখস্মৃতিও তিনি বর্ণনা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন : আমরা যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তকে ভুলে গিয়েছিলাম, এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের দায়িত্ব পালন করলাম। তিনি বলেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একজন যথার্থ কবি। হয়ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিলটিল একটু বেশী হয়ে গেছে, কিন্তু ছন্দপতন নেই। তার কবিতায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ আছে। তিনি জগতকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই ভগবানের পৃথিবীকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাই বলে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। তিনি এই পৃথিবীকে মরুময় বলে মনে করেছেন। এ জগত যেন মায়া। সেই মায়া তিনি ভেদ করতে চেয়েছেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ; পেসায় তিনি যা-ই হোন না কেন, নেশায় তিনি ছিলেন কবিতার এবং সেখানে তিনি সার্থক।

সভাপতি তাঁর ভাষণে আরো বলেন, তাঁর মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ছিল। তিনি ব্যথিত ও দুঃখিত ছিলেন সারা জীবন, সমাজ ব্যবস্থার অসংগতিতে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। দুঃখবাদ তাঁর চেতনায় রূপ নিয়েছিল।

তিনি বলেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় চিরন্তন মূল্য আছে, তা কোনদিনও ব্যর্থ হতে পারে না। তার ব্যাখ্যা থেকে আমরা তাকে বঞ্চিত করতে পারি না।

সভায় লিখিত ভাষণ পাঠ করেন কবি কৃষ্ণধর। শ্রী ধর তাঁর 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবি ও তাঁর কবিতা' শীর্ষক রচনায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিসত্তা, ব্যক্তিত্ব ও কবিতার মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন : স্বপ্নের মায়াজাল ছিন্ন করে এক নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা, তাকে ব্যাখ্যা করার এক আন্তরিকতার চিহ্ন নিয়ে কাব্য পাঠকদের সামনে এলেন মরীচিকার কবি। তিনি বলেন : যতীন্দ্রনাথ জনজীবনের কঠোর বাস্তবতাকে তাঁর কাব্যদৃষ্টিতে রূপায়িত করেছেন।....রোমান্টিকতার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রনাথ কবিতাকে নিয়ে গেছেন সেই সব ব্রাত্যজীবনের আঙিনায় যাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি ছিল কিন্তু যে-জীবন ছিল তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

কৃষ্ণধর যতীন্দ্র-মূল্যায়ন প্রসংগে বলেন, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চোখ কান ছিল তাঁর খোলা। তাঁর মনে ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িতদের প্রতি সংবেদনাবোধ। তার কবিতার উৎস মানুষ, তাঁর কবিধর্ম মানবিকতা, তাঁর চিন্তার ভিত্তি সমাজসচেতনতা।

জন্মশতবার্ষিকীর আলোকে তিনি যতীন্দ্র সেনগুপ্তের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজতে গিয়ে বলেন, অপরাজেয় মনুষ্যত্বের কবি যতীন্দ্রনাথকে পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজন আছে বাংলা কাব্য আন্দোলনের সঠিক গতিপথ ও তাঁর লক্ষ্য নিরূপণে।

অনুষ্ঠানে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ করে শোনান সর্বশ্রী মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, প্রদীপ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, অলোক পালিত, পূর্ণেন্দু পত্রী এবং রত্না মিত্র।



যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায় মঞ্চে রয়েছেন (বাম দিক থেকে) শ্রীরায়, কৃষ্ণ ধর, পূর্ণেন্দু পত্রী, মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ ঘোষ। ছবি : অরিজিৎ ভট্টাচার্য

যামিনী রায়

যামিনী রায় জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিল্পী প্রয়াত যামিনী রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল শিল্পীর শততম জন্মদিবস গত ১ বৈশাখ অর্থাৎ ইংরাজী ১৫ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখে। এই শতবার্ষিকী উৎসবের বর্ষব্যাপী অন্যান্য কর্মসূচি যা নেওয়া হয়েছে, তার ঘোষণাও সরকারিভাবে সেদিনই করা হয়েছিল। শিল্পীর বাসগৃহের একাংশে স্থাপিত যামিনী রায় শিল্প সংগ্রহশালার একটি কক্ষে সেদিন শিল্পীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে একশতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে দিয়েছিলেন অপর এক প্রবীণ শিল্পী, তিনি রথীন মৈত্র। সেদিনের সেই অনাড়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি অধিকর্তা সন্তোষ চক্রবর্তী, ছিলেন উপ-সংস্কৃতি অধিকর্তা সমীর রায়চৌধুরী, শিল্পীর পরিবারের সদ্যসরা, শিল্পীর ঘনিষ্ঠ জনেরা এবং আরো অনেক বর্তমান প্রজন্মের তরুণ চিত্রকরেরা। সংগীতে, স্মৃতিচারণে ও নিরলংকার ভাষণের মধ্যে দিয়ে গায়ক, শিল্পী এবং নিকটজনেরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছিলেন পিতৃপ্রতিম প্রয়াত যামিনী রায়কে। শিল্পীর জীবদ্দশায় তাঁর জন্মদিন যেভাবে আড়ম্বর বর্জিত হয়ে পালিত হতো এদিনও তার ব্যতিক্রম ইচ্ছা করেই করা হয়নি। কারণ শিল্পী নিজেও চাইতেন না অযথা আড়ম্বরের ঘনঘটা। অন্যান্য সময়ের মতো এদিনও উপস্থিত অতিথিদের মিষ্টিমুখ করিয়ে আপ্যায়িত করা হয়েছিল।



যামিনী রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের সেই সূচনা পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে এ বছর নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখ থেকে কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রস্থ গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় শুরু হলো শিল্পীর চিত্রকর্মের একপক্ষ কালব্যাপী প্রদর্শনী এবং শিল্পীর জীবন কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চার এক দুইদিন ব্যাপী আলোচনাচক্র। আলোচনাচক্র বসেছিল শিশির মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে, রোজ সন্ধ্যায়। এই উভয় অনুষ্ঠানেরই উদ্বোধন করেছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি তথা নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

শিল্পীর চিত্রকলার বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীই ইতিমধ্যে এই শহরে হয়ে গেছে। পাছে একই সময়ে এই রকম একাধিক প্রদর্শনীর ভিড়ে হারিয়ে যেতে হয়—সেইজন্য তখন এই সরকারি প্রর্শনীর আয়োজন করা হয়নি। এতদিনে অন্য সমস্ত প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাওয়ার পর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তাঁদেরই সংগ্রহ থেকে নির্বাচন করে আশি খানি চিত্রকর্মে এই প্রদর্শনী সাজিয়েছেন।

চিত্রের নির্বাচন ব্যাপারটি নিছক অপরিকল্পিত ভাবে করা হয়নি। বরং, শিল্পীর সাধনাকালের পর্বে পর্বে যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল—চিত্রের নির্বাচন কালে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রতি পর্যায়কে স্পষ্ট করে তোলার জন্য তাঁর বিভিন্ন সময়ের আঁকা ছবিকে নিয়ে তৈরী করা হয়েছে এই প্রদর্শনী।

১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসে জন্মের পরে শিল্পীর প্রথম জীবনের অনেকখানিই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার [illegible] গেলে, সেই গ্রাম্য [illegible], গ্রামের লোক শিল্প [illegible] ঐকান্তিক সম্পর্কের মধ্যে [illegible] রায়ের শিল্পী

জীবনের গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৬ সালে যামিনী এলেন কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে পড়তে। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পকলা শিক্ষকদের কাছে সযত্নে পাঠ নিলেন পশ্চিমী তেলরঙের ছবি আঁকার। এ বিষয়ে যামিনী অসাধারণ দক্ষতার অধিকার লাভ করেন। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য চিত্রকলার শৈলীতে তেলরঙে অজস্র ছবি আঁকলেন—প্রতিকৃতি, দৃশ্যচিত্র, আরো কত কি! ফরাসী ইমপ্রেশানিষ্ট ও পোস্ট ইমপ্রেশানিষ্টদের শৈলীতে ভালবেসে, তাদের পথ অনুসরণ করে আঁকলেন অসংখ্য দৃশ্যচিত্র, তেল রঙে। বর্তমান প্রদর্শনীতে যামিনী রায়ের সেই সময়কার বেশ কিছু চিত্র রাখা হয়েছে। এসব চিত্রের মধ্যে শিল্পীর আঁকা কয়েকজন ধ্রুপদী পশ্চিমী শিল্পীর তৈল চিত্রের কয়েকটি নকলও ছিল—যার দুই একটিকে নমুনা হিসাবে এই প্রদর্শনীতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এমন কয়েকজন শিল্পীর অন্যতম আছেন ওলন্দাজ শিল্পী রেমব্রাঁ।

আমরা জেনেছি, যামিনী রায় পশ্চিমী শৈলীতে চিত্রাঙ্কন করে কলকাতায় যখন অর্থ ও যশ দুইই প্রবলভাবে পেতে শুরু করেছেন—ঠিক তখনই তাঁর দ্বিতীয় সত্ত্বা অস্থির হয়েছে আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশের অদম্য কামনায়। ততদিনে শিল্পী অনুভব করতে শুরু করেছেন যে, এ পথ তাঁর নিজের পথ নয়। এই সময়ে তিনি ফিরতে চাইলেন নিজের জল মাটির দিকে। তাঁকে প্রবলভাবে আর্কষণ করলো দেশজ শিল্প—তাঁর বাঁকুড়া জেলা ও সন্নিহিত স্থানের পোড়া মাটির দেব দেউল, বৃক্ষতলে পূজিত লৌকিক দেব দেবীর বিগ্রহ এবং কালীঘাট ও বাংলার পটচিত্র। একদিনে বোধহয় যামিনী তাঁর সত্যিকার চলার পথটির সন্ধান পেলেন। কলকাতায় যশ ও অর্থের পথ অবলীলায় পরিহার করে, পাশ্চাত্য তৈলচিত্রের ক্যানভাস, বিদেশী তেল রং ইত্যাদি ত্যাগ করে যামিনী হাতে তুলে নিলেন সাধরণ কাগজ, গ্রাম্য গুঁড়ো রং এবং অন্যান্য নানা দেশজ চিত্রপকরণ। শিল্পীর এই নতুন পথে যে সমস্ত চিত্রের জন্ম হলো—তার কিছু নিদর্শন বর্তমান প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

বাংলার একান্ত আপন শৈলীতে এরপরে একে একে আসতে লাগলো পুরাণ, রাময়ণ, মহাভারত এবং দেব দেবীদের জীবন নিয়ে নানা চিত্র। অথচ আশ্চর্য, প্রায় একই সময়ে আঁকলেন কৃষ্ণলীলা ও খৃষ্টলীলার মতো পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় বিষয়ের অসংখ্য চিত্র। তাঁর খৃষ্ট বিষয়ক চিত্রে তাই কখনো মেরী মাতাকে পাওয়া যায় বাইজান্টাইন শৈলীতে, আবার কখনো তাঁর আদল আসে অবগুণ্ঠিতা যশোদা মায়ের স্নেহ ঢলঢল মুখাবয়বের। এই প্রদর্শনীর চিত্র নির্বাচনের সময় এদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছিল যাতে ঐ পর্বের কিছু নমুনাও বাদ না পড়ে যায়।

শুধু পুরাণ আর মহাকাব্য নয়। শিল্পীর নিপুন তুলিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে ধরা পড়েছে আদিবাসী মা ও শিশু, সাধারণ মানুষের জীবন ও ঘরকন্নার কত কাজকর্ম। বৈষ্ণব, বাউল, কীর্তনীয়া, শ্রমিক, জীবজন্তু, পাখীকিছুই বাদ যায়নি শিল্পীর দৃষ্টি থেকে। এসবেরই নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। গবেষক দর্শক একটু প্রয়াস করলে যামিনী রায়ের শিল্পী ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের একটি ধারা খুঁজে নিতে পারবেন এই প্রদর্শনীতে রাখা আশিখানি চিত্র থেকে।

অত্যন্ত যত্ন ও মর্যাদা ব্যঞ্জক সজ্জায় সজ্জিত এই প্রদর্শনীটি নিঃসন্দেহে অগণিত দর্শকের দৃষ্টি কেড়ে নেবে এবং বিলম্বে অনুষ্ঠিত করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশবাসীর কাছে অকুন্ঠ প্রশংসার অধিকারী হলেন।

যামিনী রায় জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় কর্মসূচি ছিল শিল্পীর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুষ্ঠিত দুইদিন ব্যাপী একটি আলোচনাচক্র। এই আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিলেন দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এবং খ্যাতিমান অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ডঃকল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃঅশোক ভট্টাচার্য, ডঃপল্লব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অরুণ সেন, ইন্দ্র দুগার, রথীন মৈত্র, কমল সরকার প্রমুখ।

প্রদীপ প্রজ্বলিত করে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার পর শিশির মঞ্চে এসে তথ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন—যামিনী রায় আমাদের গর্ব, তাঁর সৃষ্টির যে সম্ভার তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তার যথাযোগ্য সংরক্ষণ করা আমাদের একান্ত পালনীয় কর্তব্য। এজন্য সরকার সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তথ্যমন্ত্রী এই উৎসবের তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের জন্য আরো যে সমস্ত কর্মসূচি সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা বর্ণনা করেন। শিল্পীর চিত্রকর্মের একটি রঙিন ছবির এ্যালবাম, সুলভ পোস্ট কার্ডের সেট প্রকাশ, মূল্যবান রচনা সম্বলিত একটি শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশ এবং শিল্পীর জন্মস্থানে ও সম্ভব হলে, ভারতের অন্যান্য বড় শহরে শিল্পীর চিত্রকলার প্রদর্শনী করার মহতী ইচ্ছার কথা ব্যক্তি করেন।

আলোচনাচক্রের উভয় দিনেই বক্তারা শিল্পীর জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁর শিল্প কর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পীর জীবনের অনেক অজ্ঞাত কাহিনীকে সরসভাবে ব্যক্ত করেন। ডঃঅশোক ভট্টাচার্য ও ডঃপল্লব সেনগুপ্ত আলোচনা করেন শিল্পীর আবির্ভাবের পটভূমিকা ও তাঁর সৃষ্টির বিভিন্নমুখিতা নিয়ে। কমল সকার সচিত্র আলোচনার মধ্যে শিল্পীর সমকালের চর্চা করা বিভিন্ন শৈলীর চিত্রের মধ্যে থেকেও শিল্পীর বিশিষ্টতার দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন ও তাঁর সার্থকতার পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক অরুণ সেনের বক্তৃতার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে পিতৃপ্রতিম এই শিল্পীর সাথে তাঁরই সমকালের কয়েকজন প্রখ্যাত কবির কথাসাহিত্যিকের পারস্পরিক গুণগ্রাহিতা ও প্রীতির আশ্চর্য সম্পর্কের চিত্র, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু, কবি বিষ্ণু দে, উপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ।

ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হলেও যামিনী রায় যে তৎকালীন প্রগতির ধারাটি থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে রাখেন নি তার একটি পরিচয়ও ঐসব আলোচনা থেকে নতুন করে পাওয়া গেল। শিল্পী ইন্দ্র দুগার ও রথীন মৈত্র আলোচনা করলেন যামিনী রায়ের জীবন নিয়ে। আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে কয়েকজন শ্রোতা উপস্থিত বক্তাদের কাছে নানা বিষয়ে প্রশ্নও রেখেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট বক্তারাও যতদূর সম্ভব আন্তরিকতার সাথে দর্শকদের প্রশ্নের উত্তরদানে তাঁদের ও অপর শ্রোতাদের তৃপ্তি বিধান করেছিলেন।

যামিনী রায় জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের তৃতীয় পর্যায় আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত করার প্রস্তাব আছে।

এই প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে, শিল্পীর বাসভবন সংলগ্ন যামিনী রায় শিল্প সংগ্রহশালার স্থায়ী প্রদর্শনীটি সরকারি কার্যকালীন দিবসে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। সংগ্রহশালাটি দক্ষিণ কলকাতার ১৮নং বালীগঞ্জ প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০১৯ ঠিকানায় অবস্থিত।

—সমীর রায়চৌধুরী

যামিনী রায়

শিল্পী যামিনী রায়ের জীবন

শ্রীইন্দ্র দুগার



যে মহাশিল্পীকে উপলক্ষ করে এই স্মরণসভা, এই উৎসবের আয়োজন তাঁর জন্মের শতবর্ষ এই বছরেই পূর্ণ হলো। যামিনী রায় জন্মেছিলেন ১৮৮৭ সালে ১১ এপ্রিল। বাঁকুড়া জেলার একটি সাধারণ গ্রাম বেলিয়াতোড়। এই গ্রামের এক মধ্যবিত্ত সম্মানিত পরিবারে যামিনী রায়ের জন্ম। তাঁর পিতা রামতারণ রায় নিজে শিল্পী ছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হতেই পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায় গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্টস-এ ভর্তি হতে। সেই সময় সরকারী আর্ট স্কুলের অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ১৯০৯ সালে স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন পার্শি ব্রাউন। যামিনী রায় ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই স্কুলে থেকে তার শিল্প শিক্ষার পাঠ সমাপ্ত করেন।

জীবনের এক স্বল্প সময় এলাহাবাদে চাকুরীজীবী হয়ে কাটানোর পর যামিনী রায় একান্তভাবে চারুকলার চর্চায় আত্ম নিবেদিত হলেন। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি ছবি এঁকে গিয়েছেন এবং এতো ছবি এঁকেছেন তার হিসেব তিনি নিজেও রাখেন নি এবং তার সম্পূর্ণ চিত্র তালিকা প্রস্তুত করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। এই দীর্ঘ দিনের চিত্র রচনার ধারা যে একমুখী ছিল তা নয়। বারংবার তা দিক পরিবর্তন করেছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ এক একটি নতুন দ্বীপের সন্ধান তিনি পেয়ে গেছেন।

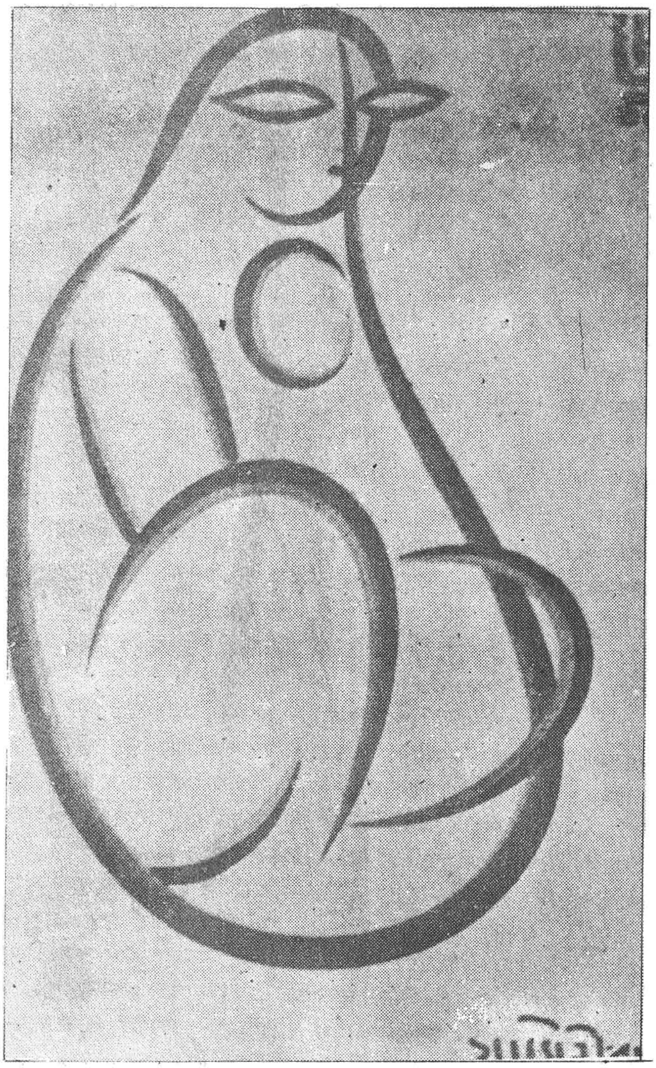
শিল্পী জীবনের শুরুতে য়ুরোপীয় একাডেমিক রীতিতেই তিনি কাজ করেছেন। য়ুরোপীয় ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পের ড্রইং এবং অঙ্কন পদ্ধতি তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করে নিজের হাতকে শক্ত করেছিলেন। প্রথমদিকে তেল রঙের যে সব ছবি তিনি করেছেন সেগুলোর মধ্যে এই দক্ষতার পরিচয় আছে। কিন্তু এইখানেই শিল্পী থেমে থাকেন নি। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে য়ুরোপীয় চারু শিল্পের জগতে যে অবিচ্ছেদী বিপ্লব চলেছিল, যামিনী রায় সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং সেই প্রভাবে বেশ কয়েকটি ছবিও করেছিলেন। কাজ করেছিলেন সত্য কিন্তু তা যেন শিল্পীর নিজের কথা নয়। ভেতরে ভেতরে কিন্তু সন্ধানের কাজ চলেছে, একটা শক্ত মাটি পাবার আশায়। ১৯২৫–২৬ সাল থেকেই বাংলার লোক শিল্পের দিকে তাঁর ঝোঁক যায়, মনে হয় তাঁর অন্বিষ্টের কাছাকাছি তিনি এসে গেছেন। কালীঘাট, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে পট সংগ্রহ করতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকার কাজ চলতে থাকে। ধীরে ধীরে ধরা দিতে থাকে সেই রেখার লীলায়িত সুষমা, বর্ণের দক্ষ ব্যবহার এবং নিজস্ব এক রীতি যাকে বলি আমরা যামিনী রায়ের ধারা। যামিনী রায় এক নিজস্ব শিল্প ভাবনা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন যাকে আমরা বললাম 'পটুয়া যামিনী রায়।' পট শিল্পের গতানুগতিকতা ঝেড়ে ফেলে এক decorative design তার ছবিকে উদ্ভাসিত করলো।

এরপর থেকে যামিনী রায়ের জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে। শিল্প জগতের এক আশ্চর্য ঘটনা এই সময়ের যামিনী রায়ের ছবি। তাঁর ছবির সঙ্গে, শিল্পীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার কথা এইখানে সংক্ষেপে বলি।

১৯৩৭ সাল। জিয়াগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসে ভর্তি হলাম কলেজে। কলেজে যাতায়াত করেও হাতে অঢেল সময়। যখন যেখানে খবর পাচ্ছি ভাল ভাল প্রদর্শনী দেখে বেড়াচ্ছি। একাডেমী অব ফাইন আর্টসের বাৎসরিক প্রদর্শনী তখন অনুষ্ঠিত হতো ভারতীয় জাদুঘরে বড়দিনের সময়। এছাড়া আরও অনেক প্রদর্শনী হতো বড় বড় শিল্পীদের বিভিন্ন জায়গায়। খবর পেলেই ছুটে যেতাম এইসব প্রদর্শনী দেখতে। এই সময় সাল তারিখ ঠিক মনে নেই, কয়েকবার গিয়েছি আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে যামিনী রায়ের প্রদর্শনী দেখতে। সে এক চমক, অন্য অনুভূতি। ছোট ছোট নিচু নিচু ঘরে ছবিগুলো সাজানো। প্রত্যেকটি ঘরের মাঝখানে সুন্দর সুন্দর আলপনার ওপর বসানো বড় বড় চিত্রিত জালা। আরো সুন্দর করে চিত্রিত জানালায় এপাশে ওপাশে ছোট ছোট মাটির পাত্র নানান সাজে সাজানো। এই সময়েই যতদূর মনে পড়ে তাঁর প্রথম দিকের ছবির সঙ্গে দৃশ্যচিত্রও বেশ কিছু দেখেছিলাম। আলাপ হয়েছিল শিল্পীর সঙ্গেও। তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর সান্নিধ্যে

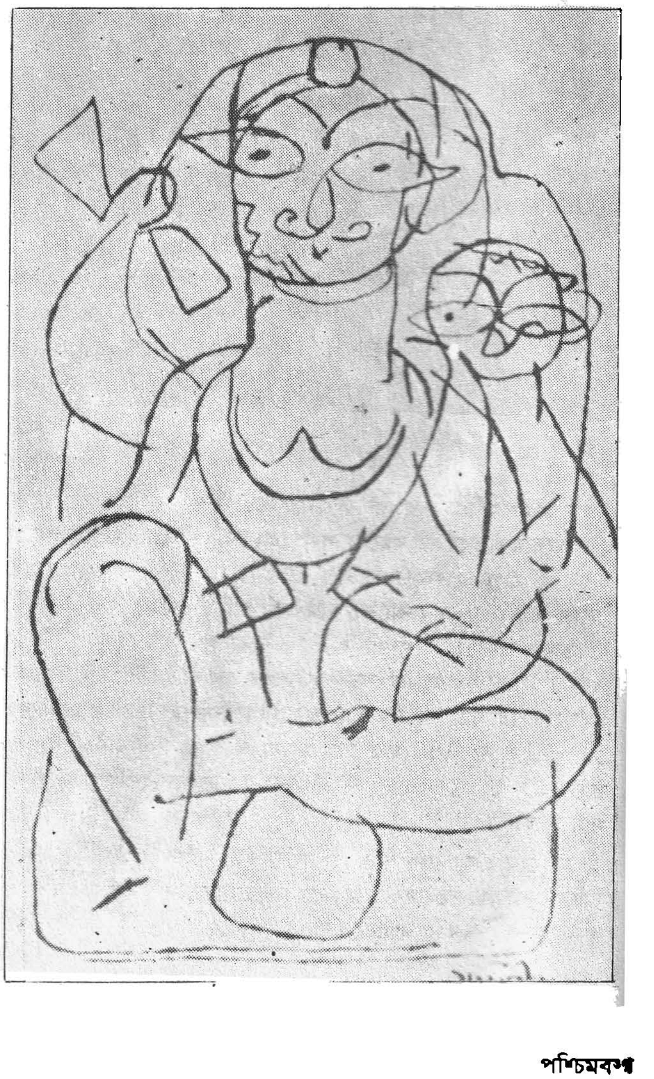
শিল্পের প্রেরণা খুঁজে পেলেন না। রাজপুত, মোগল, কোনো শিল্প কলার মধ্যেই তাঁর অতৃপ্ত মন কোনো আশ্রয় পেল না। অবশেষে পেয়ে গেলেন তাঁর প্রার্থিত শিল্পের ভাষা, একেবারে আপন ঘরের মধ্যে, বাংলা দেশের লোকশিল্পের ভাষা থেকে, বাংলার মাটির পুতুলে, পটে, কুমোরের কাজে, প্রতিমা তৈরির কারিগরিতে, পোড়ামাটির মন্দিরে লোক শিল্পের এই সমারোহ থেকে যামিনী রায় তাঁর শিল্প রচনার প্রাথমিক উপাদান পেয়ে গেলেন। এই প্রাথমিক উপাদান হলো, লোক শিল্পের বাহুল্যহীন নিরাভরণ রূপকল্পনা এবং ছবিকে নিছক ছবি হিসেবেই দেখানো অর্থাৎ কোনোরকম বাস্তবধর্মী (realistic) না করে কেবলমাত্র সুনিপুণ রেখা এবং সহজ বর্ণের ব্যবহার করে ছবির বক্তব্যকে ব্যঞ্জনা দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে একে অনুসরণ না বলে লুপ্ত পথের পুনরুদ্ধার বলাই শ্রেয়। কারণ এই লোক শিল্প ফটোগ্রাফি গুণ বিশিষ্ট সমগ্র শিল্প রচনা থেকে এত স্বতন্ত্র অথচ মৌল শিল্প আবেদনে পরিপূর্ণ যে সেই আকর্ষণই তাঁকে শিল্প রচনার নতুন পথের সন্ধান এনে দিলো।

ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের পর থেকে য়ুরোপীয় শিল্পকলায় যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে তা হলো বাস্তবধর্মী শিল্পকলাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ফর্ম ও ডিজাইনের নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যামিনী রায় য়ুরোপের এই শিল্প বিপ্লবের কথা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, তাই পটের শিল্প রীতিকে তিনি নতুন ফর্ম ও ডিজাইন উদ্ভাবনের বাহন করে শিল্পরচনার সূত্রপাত করলেন। এই ধারার কাজে প্রথম দিকে তাঁর ছবিতে দেখা দিল মোটা অথচ



বহুবার এসেছি। আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছি। শিল্পী এর কিছুদিন পরে সেই পুরোনো বাড়ি ছেড়ে তাঁর নিজস্ব নতুন বাড়ি বণ্ডেল রোডে উঠে এসেছেন। সে অন্য পরিবেশ, অন্য জগৎ। এখানেও বারবার গিয়েছি নানা উপলক্ষে, কিন্তু আজও আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের সেই প্রদর্শনীগুলোর পরিবেশের কথা ভুলতে পারিনি। সেই সময়ের প্রদর্শনীগুলো যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা যামিনী রায়ের আর একটা দিক দেখতে পান নি—প্রদর্শনী ছবি এবং ঘরকে সম্পূর্ণ দিশি প্রথায় কি করে সাজাতে হয়।

যামিনী রায় সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তা হলো যে তিনি নাকি বাংলার পট শিল্পকে অনুকরণ করে তাঁর শিল্প রচনা করেছেন। ধারণাটি আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। বাংলা পট শিল্পের সঙ্গে যামিনী রায়ের ছবির একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর ছবির রীতি পদ্ধতি এবং ছবির মেজাজ একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া শিল্পী জীবনের শুরু থেকে তিনি ট্রাডিশনাল য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন এবং সেসব ছবিতে তাঁর দক্ষতাও খুব সুস্পষ্ট। অবশেষে উত্তর তিরিশে পৌঁছে এই উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল যে এ পথ তাঁর নয়। নতুন করে তিনি শিল্পের ভাষা পদ্ধতি ও প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য শিল্প আন্দোলনের উত্তেজনা যদিও তখন অনেকটা কমে এসেছে, তিনি তার মধ্যেও কোনো



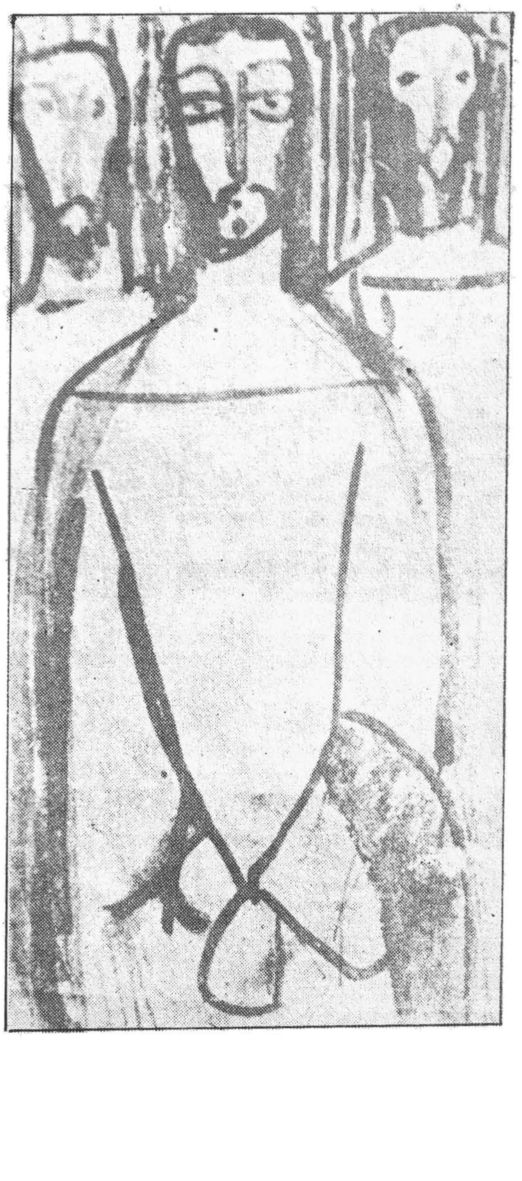
দৃঢ় রেখা, অনেকটা কালীঘাটের পটের আভাস, রূপরচনায় (Composition) বাহুল্যহীনতা এবং দেশীয় প্রাথমিক রঙের ব্যবহার। সাধারণতঃ এই রঙ সাতটি বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন Indian Red, Yellow Ochre, Cadmium Yellow, Green, Vermillion, Grey, Blue এবং White, রেখা রচনায় যেখানে কালো রঙ ব্যবহার করেছেন তা এসেছে প্রদীপের ভূষো কালি থেকে। ছবির চিত্রপট তৈরি হয়েছে ঘরে বোনা কাপড় দিয়ে তার ওপরে লেপে দিয়েছেন মাটি ও গোবরের প্রলেপ, কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন হাতে তৈরি কার্ডবোর্ড অথবা চাটাই। ছবির বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে প্রথম যুগে গ্রামের মানুষ, বাউল, কীর্তনীয়া অথবা বৈষ্ণবধর্মের কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন রূপারোপ। এইসব ছবিতে ডিজাইনের সুষম ব্যবহার ছাড়াও ছন্দ ও ভঙ্গিমার আশ্চর্যজনক বিশেষত্ব আছে। শুধু অকম্পিত রেখা রচনা নয়, উদ্দেশ্যের সংগে সমতা রেখে রঙের ব্যবহারও অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে।

কিন্তু যামিনী রায় এর মধ্যেই থেমে যাননি। রেখা ও রঙকে আরো কিভাবে সহজ করা যায়, চিত্রপটের মধ্যে ছবির ডিজাইন আরও কিভাবে ব্যঞ্জনাময় হয় তারই অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হয়ে রইলেন। এ পর্যন্ত ছবিতে রঙ,রেখা ও রূপ রচনার (Composition) সরলতা থাকলেও কোথায় যেন একটা Sophistication এর ছায়াপাত ছিল। এই পর্যায়ে যে ছবি আঁকতে শুরু করলেন তাতে চিত্রপট ও রূপ রচনার ছন্দ ও ভারসাম্য বিশেষভাবে প্রাধান্য পেল। রূপ রচনা চিত্রপট ও ফ্রেমের মধ্যে আর আবদ্ধ হয়ে রইল না। ফ্রেমকে অতিক্রম করে ছবি যেন অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হলো। চিত্র রচনার এই বাহাদুরি তাঁর ছবিতে এক নতুন প্রসাদগুণ এনে দিয়েছে এবং দর্শককে এক অদৃশ্য রূপ জগতের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সুদীর্ঘ শিল্পী জীবনে তিনি অবিশ্রান্ত কাজ করে গিয়েছেন। কেবলমাত্র শিল্প আবেগের উপর নির্ভর করে তিনি ছবি আঁকেন নি, চোখ ও মন একসংগে খোলা রেখে তিনি ছবি এঁকেছেন। শিল্প রচনার সময় শিল্পীকে যেসব নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, শিল্পী মনের দিক থেকে তা বিচার করেছেন এবং ছবির মধ্যে সে সমস্যার সমাধানও করেছেন। এই করতে গিয়ে একই বিষয়ের ছবিকে তাঁকে বারংবার আঁকতে হয়েছে অথচ কোনো ছবিই মূল ছবির হুবুহু নকল হয়নি। তাঁর বিশ্লেষণী মনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল এই ছবিগুলি।

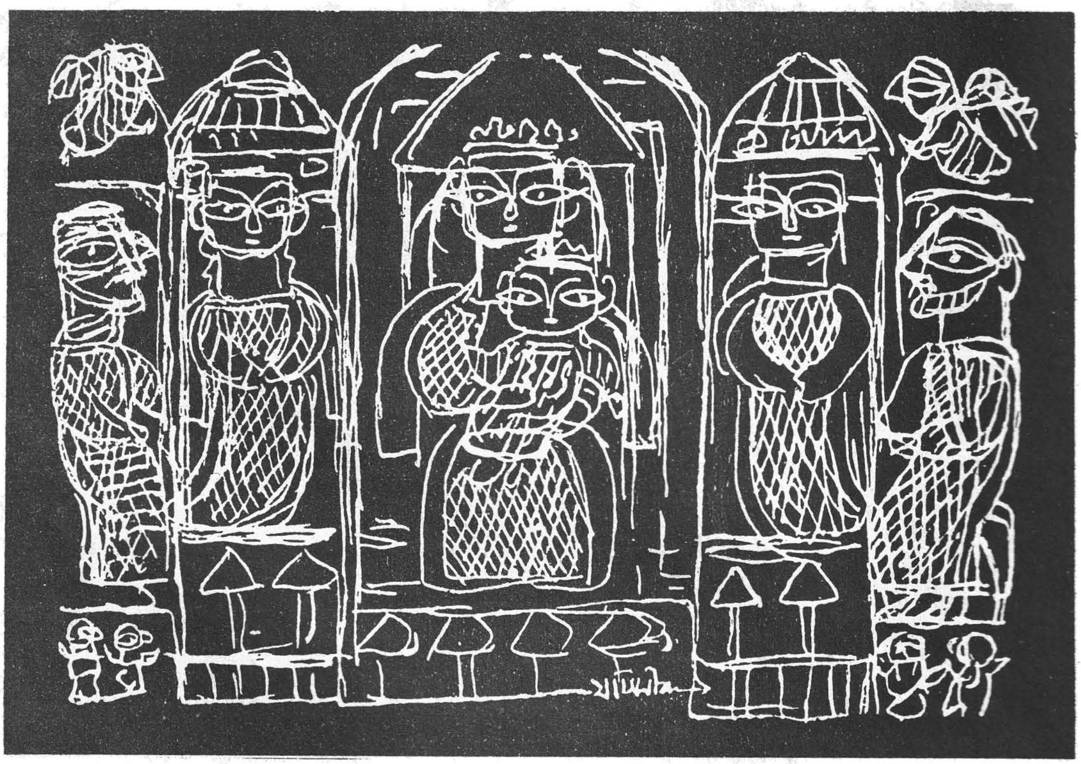
তাঁর প্রথম দিকের আঁকা ছবিগুলি মূলত রেখা-প্রধান, যদিও তা পটের ছবির রেখা নয়। রঙ সেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পরবর্তী যুগে রঙের ব্যবহারে তিনি অনেক মনোযোগী ও সতর্ক। ইম্প্রেসনিস্ট পদ্ধতিতে তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে চিত্রে রূপায়িত করেছেন। ফলে ছবিগুলি রঙ প্রয়োগের এক আশ্চর্য নিদর্শন হয়ে আছে।





চিত্র সমালোচক শ্রীঅশোক মিত্র তাঁর শেষের দিকের ছবিতে রঙ ব্যবহার সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন–গত পাঁচ বছরের কাজে পাওয়া যায় তাঁর রঙ সম্বন্ধে নতুন করে সচেতনতা। এতদিনের কাজে বর্ণ শিল্পী হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা যেত না। রঙকে তিনি প্রতিমা (image) ও ভাবাবেশ আমেজের কাছে গৌণ করে দিতেন। কিন্তু গত কয়েক বছরের কাজে দেখা যায় রঙ ও আলো সম্বন্ধে অদ্ভুত তাগিদ, দিশি রঙের ব্যবহারে মনে হয় যেন তিনি ইউরোপীয় মহারথীদের চিত্রের স্নিগ্ধ, স্থির, উজ্জ্বল অনুভূতি, বনেদী কমনীয়তা ও ইংরাজীতে যাকে বলে 'প্যাটিনা' আনতে চান।

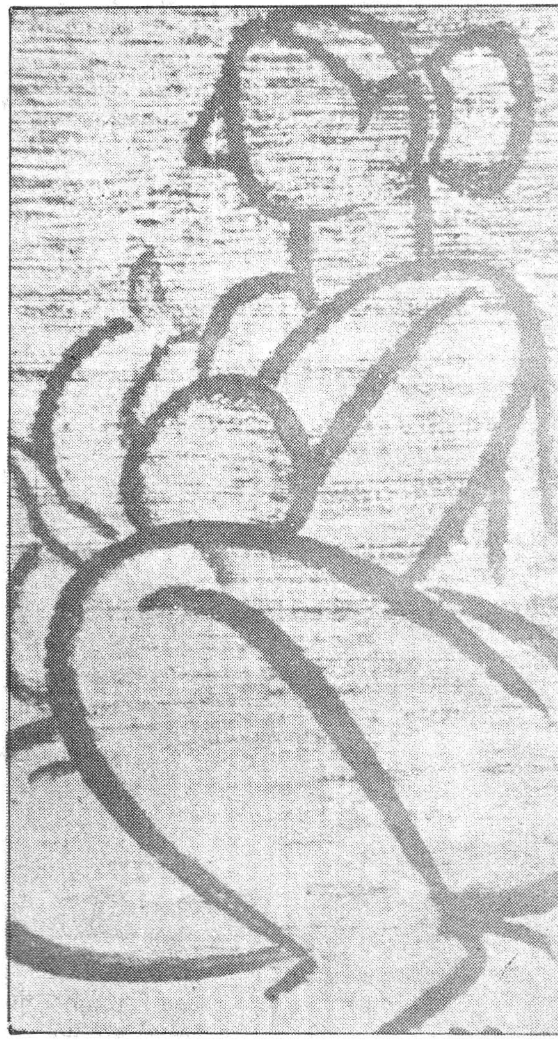
ভারতবর্ষের শিল্প সরস্বতীর দুই রূপ। একদিকে তিনি রাজেন্দ্রাণী, তাঁর গাম্ভীর্য ও বহু বিচিত্র মহিমা নিয়ে ধরা দিয়েছেন ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, অজন্তায়। আর এক দিকে তিনি বসে আছেন আমাদের মাটির ঘরে মায়ের মূর্তি নিয়ে। প্রদীপের স্নিগ্ধ প্রভায় বিকীর্ণ হচ্ছে তাঁর মুখ মন্ডলের ধৈর্য, স্নেহ ও প্রশান্তি। যামিনী রায় এই প্রান্তীয় শিল্পীকূলের শেষ মহত্তম প্রতিনিধি।



যামিনী রায়

যামিনী রায় ও লোকশিল্প

শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত



আমাদের অনেকের মধ্যেই একটি ধারণা প্রায় সংস্কারে পরিণত হয়েছে যে, যামিনী রায়ের চিত্রকলার মধ্যে বাংলার লোকশিল্পের, বিশেষত পটচিত্রধারার একটি পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে বাংলার নিজস্ব ধারার শিল্পকলা পটের ছবির সংগে তাঁর অধিকাংশ ছবির ভাব এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এমনই সব সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে—যার ফলে সহসা ঐ ধারণা-তথা-সংস্কারটি সত্য বলেই যেন প্রতীত হয়। আপনারা নিশ্চয়ই প্রশ্নমনস্ক হয়ে উঠছেন এই কথা ভেবে যে, তাহলে কি এটাই বলতে চাওয়া হচ্ছে যে তাঁর ছবি সত্যিসত্যিই বাংলার পটচিত্রের ধারাকে প্রবহমান রাখেনি? ঐতিহ্যবাহী ঐ লৌকিক শিল্পধারার সংগে তাহলে তাঁর আঁকা হাজার-হাজার ছবির এমন ভাবরূপের সাদৃশ্য থাকে কেমন করে? ....এ সব প্রশ্ন খুবই সংগত; এবং এদের নিরসন করার জন্য একটা বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা দরকার যে, সেটাও আবার ঠিক। অর্থাৎ, যামিনীবাবুর শিল্পের যথার্থ পটভূমিটা একবার একটু জেনে-চিনে নেওয়াটা অবশ্যই জরুরী।

পাশ্চাত্য রীতি বলতে সচরাচর যা বোঝায়—মানে, আলোকচিত্র-সুলভতা-পার্সি ব্রাউন—প্রমুখের শিক্ষণে তাতে ঋদ্ধ হয়ে যামিনী বাবুর শিল্পী জীবনের মুখবন্ধ হয়ঃ এ তথ্য সবারই জানা। কিন্তু তিনি অল্প কিছুকালের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, "নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ খুব দূরে যেতে পারে না।" অতএব সৃষ্টির অফুরান রাস্তায় বহুদূর অবধি এগিয়ে যেতে হলে, পথের সম্বল করতে হয় নিজের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে। সুতরাং 'ক্যাপটিভ লেডী' কিংবা 'রাজমোহন'স ওয়াইফ' দিয়ে শুরু করেও একদা 'মেঘনাদ বধে'র কবি এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কথাকার যেমন ফিরে এসেছিলেন নিজের উত্তরাধিকারের স্বচ্ছন্দ অংগনে, ঠিক তেমনই ফিরলেন যামিনী রায়ও তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্যের জমিতে। 'বেংগল-স্কুল' নামে যে বিশেষ একটি ধারা তখন রীতিমতো তৈরী হয়েছে এদেশের শিল্পী সমাজে, সেই প্রবাহে তিনিও ভাসলেন প্রাথমিকভাবে কিছুদিন।

কিন্তু 'বেংগল-স্কুল'-ও যথা-অর্থে পাশ্চাত্ত্য শিল্পের সংগে পুরোপুরি নিঃসম্পর্কিত ছিল না। নামে 'বেংগল-স্কুল' হলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী চিত্ররীতির সংগেই তার আত্মীয়তা বরং ছিল বেশি দূরান্বয়ী। সুতরাং 'বেংগল-স্কুল'কে ছেড়ে তাঁর সৃষ্টির প্রবণতা চিনতে চাইল প্রকৃত 'বেংগল'কে তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "আমার গ্রামকে, আমার জেলাকে, আমার বাংলাকে।"

।। ২ ।।

তাঁর গ্রাম বেলিয়াতোড়, জেলা বাঁকুড়া, রাজ্য বাংলার যে-ভাব-ঐতিহ্যে তিনি ডুব দিলেন, সেখান থেকেই উঠে এল তাঁর পরবর্তীকালের সমারোহময় সংখ্যায় অনির্ণেয় অসংখ্য ছবি। প্রকাশের সঠিকতম অভিব্যক্তিটি তিনি খুঁজে পেলেন শিশুর চিত্রশৈলীতে। লোকায়ত সংস্কৃতির মগ্নচৈতন্যে যে আদিম সারল্য এবং বিস্মিত মুগ্ধতা লুকিয়ে থাকে, তারই ভিন্নতর অভিব্যক্তি ঘটে শিশুর শিল্পের মধ্যে। লোকপুরাণ-তথা-ফোকমীথে, রূপকথায়—ছেলে ভুলোনো ছড়ায় এবং লোকশিল্পকলায় সৃষ্টির বাহিরঙ্গিক প্রকাশটুকুর আড়ালে অন্তরংগ হয়ে থাকে আদিম সারল্য, শিশুর বিস্ময়, সেই মগ্নচৈতন্যই গড়ে তোলে সংস্কৃতির ঐতিহ্য।

এখানে কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যক্ষভাবে যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর সৃষ্টির উত্তরাধিকারাগত ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেখানে সামাজিকভাবে নানান্ স্তরের অবদান রয়েছে। মল্লভূমের জংগল মহলে—যেখানে তাঁর পিতৃপুরুষেরা এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছিলেন—সেখানে সাংস্কৃতিক-বুননটুকু গড়ে উঠেছিল একই সংগে আদিবাসীদের, লোকসমাজের নিচের তলার মানুষদের এবং তথাকথিত-শিষ্ট সমাজের মাঝের এবং ওপরতলার অধিবাসীদের সমবেত অবদানে। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরগুলির দেওয়ালের বহুবিচিত্র ভাস্কর্যে অলঙ্করণ এবং মূর্তিবিন্যাসের সূক্ষ্ম ও সাবলীল সম্ভার; মন্দির ভাস্কর্যের মধ্যের লৌকিক





ভাবধারার উদ্ভাস; বর্ণাঢ্য দশাবতার তাসের চিত্র সমৃদ্ধি; পুঁথির গায়ের কাঠের পাটার উপরে পটধর্মী অলংকারসজ্জা; আদিবাসীদের নানা ধরনের শিল্পকলা; ডোকরা কামারের গড়া মূর্তি এবং পুতুল; সোনামুখী, পাঁচমুড়া, মুর্লু-র নিজস্ব সব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া, কুদ্রা, বড়াম, সিনি, প্রভৃতি গ্রাম দেবতার নামে মানত করা আদিমকালের আদলে গড়া মাটির ছলন পুতুল; আর বেলিয়াতোড়েরই সন্নিকটে পটেরিপাড়ার বর্ণোজ্জ্বল পটচিত্র এবং অবশ্য গ্রাম বাংলার একান্তভাবে নিজস্ব শিল্পধারা আল্‌পনা–এর সব কিছুই একে অন্যের প্রতিবেশিত্বে সমারূঢ় হয়ে গড়েছে বাঁকুড়া লৌকিক চারু এবং কারুকলার পরিমন্ডল। সেই পরিমন্ডলের প্রতিভাস যামিনীবাবুর শিল্পীমননের অন্তর্লোকে অবলীন হয়েছিল আশৈশব, আজীবন। তাই শিল্পী যখন বুঝলেন: "আমার নিজের ঐতিহ্যে ডুব দিতে হবে–", তখনই তাঁর মগ্নচৈতন্য থেকে যে সৃষ্টির অভিপ্রেরণা উৎসারিত হল, তার অবধারিত উৎস ছিল বাঁকুড়ার ঐ লোকায়ত শিল্প ঐতিহ্য।

।। ৩।।

এই উৎস থেকে ক্ষরিত হয়ে এসেছে যে শিল্প, স্বভাবতই তার উপকরণ এবং অভিব্যক্তিতে ঐ উত্তরাধিকার স্পষ্ট মাত্রায় ফুটে উঠবেই। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি মন্তব্য মনে পড়ছে; তাঁর ছবিতে "পটের প্রভাব নেই, সদ্ব্যবহার আছে।" মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য কেন না এটি করেছিলেন যিনি, তিনি যামিনী রায়ের কয়েক দশকের সুহৃদ ও গুণগ্রাহী, এবং অবশ্যই তাঁর শিল্প সম্বন্ধে অভিমত দেবার অধিকারী। এ মন্তব্য কবি বিষ্ণু দে-র; যামিনী বাবুর শিল্পকে ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর অবদানের কথা সবাই জানেন আপনারা। সুতরাং তাঁর বক্তব্যকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিধায় গুরুত্ব দিতেই হবে।

তাহলে, পটের চিত্রশৈলীর সংগে যামিনীবাবুর লোকায়ত রীতির ছবির ভাবরূপের আত্মীয়তা কতখানি? .....ঐতিহ্যবাহী পট–হোক না তা জাদুপট, কি যমপট, কিংবা চক্ষুদান পট, অথবা গাজীর পট, নয়ত মনসা পট, কি কৃষ্ণলীলা পট–তাদের শিল্পীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঠিক একই ঢঙে, একই রকমের রঙে ছবি আঁকেন এবং প্রায়শই সে-সব ছবি যৌথ সৃষ্টি। তেমন কথা যামিনীবারবুর ছবি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলব না। কিন্তু পটের রঙ- এবং ঢঙ নিয়ে নিরীক্ষা তিনি যেভাবে করেছিলেন নিজের ছবিতে, তার থেকে একটা কথা বলব যে, ঐ-ঐতিহ্যকে ভালবাসতেন, তাকে আত্মস্থ করার অভীপ্সা তাঁর ছিল। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পটশৈলীতে ছবি যখন তিনি আঁকছেন, তারই মধ্যে-মধ্যে তাঁর ছবিতে কখনো-কখনো দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্য ঢঙের নিসর্গ-চিত্রণ, প্রতিকৃতি-রূপায়ণ, চৈনিক-এবং-তিব্বতীয় রীতির চিত্রানুসরণ এমনকি বাইজান্তীয় ধারায় মোজেইক সাজানো মূর্তির উদ্ভাসনও। অর্থাৎ, পটচিত্রের পাশাপাশি এক্সপেরিমেন্ট চলছিল আরও নানান দেশের ফর্ম এবং টেকনিক নিয়েও। অমন এক্সপেরিমেন্ট তাহলে কি

পটশৈলীর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও হয়নি?....তাঁর চিত্রসৃষ্টির অভিনিবিষ্ট ছাত্র মাত্রেই বলবেন যে, "হ্যাঁ, তাও তো হয়েছে।" নিটোল শক্তিমন্ত রেখা এবং উজ্জ্বল-ও-লাবণ্যময় বিচিত্র বর্ণবিন্যাস দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিল তাঁর পটধর্মী ছবির প্রকাশ মাধ্যম। কালক্রমে ভাঙা-ভাঙা তুলির টানে অনুজ্জ্বল একরঙা পটের অনুসারী ছবিও তিনি এঁকেছেন যথেষ্টই। চাটাইয়ের টুকরোর ওপর যে-সব ছবি এঁকেছেন, সেগুলিও ট্র্যাডিশ্যানাল পটের আঙ্গিকগত অনুশাসনকে অতিক্রম করে গেছে। ট্র্যাডিশ্যনকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন নিজের ইচ্ছার অনুযায়ী; অর্থাৎ, প্রভাব-সর্বস্বতা নয়, নিজের সৃষ্টির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন পটশৈলীকে।

কিন্তু বাংলা লোকশিল্পের মধ্যে শুধু কি পটই তাঁকে উপকরণ জুগিয়েছে? পট সেখানে আছে অবশ্যই; কিন্তু অন্যান্য প্রকরণের ভূমিকাও সেখানে কম প্রাসঙ্গিক নয়। বাঁকুড়ার লৌকিক চারু-ও-কারুকলার পরিমন্ডলের পরিচয় দিতে গিয়ে ঐসব প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছি কিছু আগে। যামিনীবাবুর ছবিতে পটের আদল যতটা এসেছে, তার চেয়ে বেশি এসেছে দশাবতার তাসের ওপরে আঁকা ছবির আদল। গাঢ় বর্ণবিলেপন এবং বলিষ্ঠ সুষম পুরু তুলির টানে আঁকা ছবিগুলির মধ্যে যেখানে মানুষের মূর্তির পাশ থেকে দেখা রূপটি দেখি, সেখানে তো পটের বদলে দশাবতারের মূর্তিবিভঙ্গকেই বেশি আভাসিত হতে দেখি। সামনাসামনি-আঁকা মনুষ্য মূর্তিও বহুসময়ে কাঠপুতলি বা মামি ডলের আভাস আনে সন্দেহ নেই। যে-সমস্ত হাতি-ঘোড়া তাঁর ছবিতে মূর্তিমন্ত, তাদের আকৃতি পটের হাতি-ঘোড়ার মতো নয়; বরঞ্চ বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কিংবা ডোকরা ঢালাইয়ের হাতি-ঘোড়ার সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ঢের বেশি। স্টাইলাইজেশনের দরুণ প্রচলিত পটের রেখা এবং রঙ থাকা সত্ত্বেও পুতুল-পুতুল আদলই তাদের মধ্যে বেশি।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এই সব মন্দিরগুলির দেওয়ালে এক-একটি চৌকোণা পাথর বা পোড়ামাটির টালির মধ্যে নানা ধরনের স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঘটনার মূর্তিরূপায়ণ বহুলাংশেই পটচিত্রের চরিত্রধর্মী। প্রকাশ মাধ্যমটা শুধু পৃথক: চিত্র নয়, ভাস্কর্য। কিন্তু এই প্রাকার-ভাস্কর্যে যে-সমস্ত মূর্তি, বিশেষত নৃত্যভঙ্গিম মূর্তি তক্ষণ করা হয়েছে তাদের ফর্ম-গত অনুসৃতি পটের অনুরূপ মূর্তির-থেকে আলাদা-ঢঙের। যামিনীবাবুর ছবিও তার চৌকোনো চৌহদ্দীর মধ্যে ইট-পাথরের সীমায় বাঁধা মন্দির ভাস্কর্যের মূর্তিবিভঙ্গেরই আদর্শকেই অনুসরণ করেছে; বিষয়ের ক্ষেত্রে বহু সময়ে, আর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আরও বেশি সময়ে। নৃত্যপরা রমনীমূর্তি তাঁর ছবিতে যখনই উদ্ভাসিতা, তখনই একথার সপক্ষে বলতে হয় অবধারিতভাবে। আল্পনার মৌটিফ ছবির পাড়ে, অলঙ্করণে এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে চিত্ররূপেও—যেমন পাখি বা মাছ, কখনো ফুল, কখনো গাছ—ইত্যাদিতে প্রকাশমান।

।। ৪ ।।

এ সব তো গেল পট ছাড়া অন্যান্য কোন্-কোন্ লৌকিক শিল্পের প্রকরণ বা 'জাঁর' তাঁকে সৃষ্টির উপকরণ যুগিয়েছে, তার যৎসামান্য হদিশ। পটধর্মিতা সেখানে কতটা?...প্রথমত, একটা কথা: অনেকেই রেখার ঋদ্ধতার কারণে যামিনীবাবুর ছবির প্রসঙ্গে কালিঘাটের পটের কথাও এনে ফেলেন বটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ঐ দুয়ের মধ্যে আর কোনো যোগসূত্র খুঁজতে যাওয়া দূরান্বয়ীই হবে।

এর কারণ, কালিঘাটের পট আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য থেকে আঙ্গিক এবং উপলব্ধি উভয় ক্ষেত্রেই সরে গেছে। পটের ছবির চিরন্তনী দ্বি-মাত্রিক রূপায়ণের বদলে, ইউরোপীয় বস্তুনিষ্ঠ চিত্রধর্মের অনুসরণ করার প্রয়াসে কালিঘাটের পটের মধ্যে জোরালো রেখার পাশেই আলোছায়ার আভাস সৃষ্টি করে ত্রি-মাত্রিকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ঐতিহ্যবাহী লৌকিক চিত্রধারার থেকে খুব বড় একটি বিচ্যুতি এবং এই চ্যুতি যামিনী রায়ের ছবিতে কিন্তু নেই। কালিঘাটের পটের রেখাগত প্লাস্টিক-গুণ আছে, কিন্তু ইউরোপীয় ছবির আদলে ত্রিমাত্রিকতা সৃষ্টির প্রয়াস তার মধ্যে নিরস্তিত্ব।

কালিঘাটের পট সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও কিছু মানসিকভাবে আপত্তি ছিল। কালিঘাট শিল্পে নমনীয় বঙ্কিম গতিতে যেভাবে মূর্তিচিত্রণ হয় সেই 'প্লাস্টিক'-গুণ তাঁর পছন্দসই হলেও, তার মধ্যে নাগরিক ধর্ম যেভাবে সর্বব্যাপকভাবে এসে পড়েছে, বিশেষত ছবির বিষয়ে, সেটি ছিল যামিনী বাবুর না-পসন্দ। বিদেশী অধিকার, গ্রাম থেকে রুজির সন্ধানে চলে আসা, শহরবাসী শিল্পী এবং কলকাতার বাবু কালচারের পৃষ্ঠপোষণা ইত্যাদির সমন্বিত কারণে কালিঘাটের পট তাঁর ভাষায় "আদর্শ বিচ্যুত হল.... ।

সুতরাং, ভাবের দিক থেকে পুরোটাই এবং আঙ্গিকের দিক থেকে অনেকখানিই বিপ্রতীপ ছিল কালিঘাটের পট এবং যামিনী রায়ের শিল্পরুচি। বিশেষত, মূল পটশৈলীর মূল অভিপ্রেরণা হিসেবে তিনি মিথকে চিহ্নিত করেছেন। কালিঘাটের পট সেই লৌকিক পুরাণ ঐতিহ্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, যামিনী বাবুর নিজের ছবিতে কিন্তু ঐ মিথোলজি কখনো স্পষ্টই আবার কখনো ফল্গুতোয়া হয়ে সঞ্চরণ করেছে। রামায়ণ-চিত্রাবলী, কৃষ্ণকথায় ছবিসমূহ, মনসা-পাঁচালীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছবি—এ সবের অন্তর্গত উপলব্ধি তো সহজবোধ্যই। কিন্তু যেখানে মিথ্ এভাবে সরাসরি ছবির উপজীব্য হয়নি, সেখানে?

সেখানেও মিথের মানসিকতা ছবির অন্তর্লীন ভাবনার কাঠামোতে—ইনফ্রা-স্ট্রকচারে—উপাদান জুগিয়েছে। কথাটা একটু বিশদভাবে হয়ত বলা দরকার। ধরুন তাঁর বহুনন্দিত 'মা ও শিশু'-পর্যায়ের অজস্র ছবির কথাই। এই ছবি তিনি নানাভাবে এঁকেছেন 'বেঙ্গল স্কুল'-ঢঙে আঁকা গ্রাম্য নারী; কোলে আকাশের দিকে হাত উঁচোনো ন্যাংটা খোকা; ঘোমটা ঢাকা মায়ের কোলে আঁচল দিয়ে মুখটা ঢাকা চোখ জুলজুলে খোকন; কৃষ্ণ এবং দুগ্ধ দোহনরত যশোদা, গণেশ ও দুর্গা আর ম্যাডোনা এবং যীশাস্—সবই আসলে একই ভাবনার বৃত্তে সঞ্চরমান। মূল মিথিক-চরিত্রটা হয় কৃষ্ণ-যশোদা, আর নয়ত যীশাস-ম্যাডোনা।



মিথের প্রসংগে যীশাস-ম্যাডোনা বা সাধারণভাবে যীশু কেন্দ্রিত খৃস্টীয় ভাবানুষংগবাহী চিত্রমালার কথাটুকুও এখানে একটু বলি। 'নিজের ঐতিহ্যে ডুবে ছিলেন'—ইত্যাদি মর্মে যে কটি কথা ওপরে আলোচিত হয়েছে, তার সংগে এইসব খৃস্টীয় অনুষংগের সামঞ্জস্য কতটা ? আছে। বাঁকুড়ার লোক জীবনে, বিশেষত আজকের সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাঁরা 'সাব-অলটার্ন' বলে অভিহিত হন, সেই সব সামাজিক অবর বর্গীয়দের জীবনে খৃস্ট ধর্মের একটা অভিক্ষেপ ছিল। বাঁকুড়ার জন জীবনে খৃস্টীয় যাজকরা তাঁদের সেবা ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে সাধারণ ভাবে একটা মৃদুভাব ফেলেছিলেন—যা বজায় ছিল এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও, তাই ঐ 'সাব-অলটার্ন'-দের সংস্কৃতিতেও, যীশাস-ম্যাডোনা, যীশুকে নিয়ে জোসেফ এবং মেরীর মিশরে পালানো, ক্রুশবিদ্ধ যীশু মূর্তির পদতলে উপাসনারতা অনুতপ্তা মেরী মাদলীন, দ্বাদশ শিষ্য সহ যীশাসের শেষ নৈশাহার ইত্যাদি কাহিনী, কৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণ এবং কালীয় দমন, রাবণের জটায়ু বধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, মকর বাহিনী গংগা, গণেশ জননী, মনসা-চন্দ্রধরের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির মতোই আত্মস্থ হয়ে থাকা বিষয়। মেদিনীপুরের মুসলিম পটুয়ারা যেমন নির্দ্বিধায় আঁকেন রামলীলা-কৃষ্ণলীলা-মনসা কথার পট, সুন্দরবনের সন্নিকটস্থ এলকার হিন্দু পটুয়ারাও যেমন অসংশয়ে গাজীর পট আঁকেন, ঠিক তেমনিভাবেই বেলিয়াতোড়ের হিন্দু-মুসলিম পটুয়ারাও একসময়ে সাগ্রহে এঁকেছেন যীশুপট।

অর্থাৎ এটাই বলতে চাইছি যে, যামিনীর যীশু চিত্রাবলী ভাবগত দিক থেকে লৌকিক সংস্কৃতির সূত্রবাহী। সুতরাং তাঁর যীশুও অনেক সময়ে মালকোঁচা সহ ধুতি পরিহিত মেরীর মাথায় কখনো কখনো ঘোমটার আদল ইত্যাদি এসে গেছে। এক কথায় বাংলার জনজীবনের প্রতিভাস বাইবেলীয় মিথের চিত্রায়নেও এসেছে স্বচ্ছন্দ আবেগে, যেমন এসেছে রূপকথার বুদ্ধ-ভুতুম, পক্ষীরাজ ঘোড়া, ব্যাংগমা-ব্যাংগমী; এসেছে বাউলের দল, কীর্তনের দল, সাঁওতালী নাচ, হুঁকোয় টান দেওয়া গ্রাম্য পুরুষ, রাখাল ছেলে, কোনো এক গাঁয়ের বধূ, পল্লি বালিকারা, পাখি হাতে বালক ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র প্রাত্যহিক বিষয়, চেনাজানা উপজীব্য। লোকজীবনের সংস্কৃতির বহু বিচিত্র অভিপ্রকাশ। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা সবাই জানেন এবং মানেন যে লোকজীবনের মগ্নচৈতন্যে সুস্থিত হয়ে থাকে পুরাণ সমৃদ্ধ প্রত্যয়ের প্রতিভাস। তাই লোক জীবনের চিত্রায়নে চিরন্তন সেই ঐতিহ্যের অনুবর্তনই ঘটে অলক্ষ্যে। কালিঘাটের পটচিত্র ধারায় সেই উত্তরসরণ গরহাজির; তা আছে, যামিনীবাবুর ছবিতে।

॥ ৫ ॥

আঁকার ক্ষেত্রে, বিষয়গতভাবে যামিনীবাবু লোকায়ত প্রেরণায় কতখানি প্রবুদ্ধ তার বিচারের সংগে সংগেই আঙ্গিকের ব্যাপারেও সে প্রথা কতখানি সোচ্চার, দেখা দরকার। কালিঘাটের পটের আঙ্গিক প্রসংগে সে কথা কিছুটা আলোচনা করেছি কিছু আগে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে আরো কিছু বলা দরকার। প্রথমেই রঙ : নানা ধরনের লাল রঙ তাঁর ছবিতে ব্যবহৃত হতে দেখছি বরাবরই। বাঁকুড়ার প্রাকৃতিক রক্তিমতার সূত্রেই কিনা জানিনা ঐ অঞ্চলের পটে এই বর্ণটি বেশ প্রভাবশালী; অন্য ধরনের লোকশিল্প, যেমন পুতুল বা পোড়ামাটির ভাস্কর্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। পটে বা পুতুলে যে সমস্ত রঙ ব্যবহৃত হয় সচারাচর, যামিনী বাবুর ছবিতেও মুখ্য রঙ অবশ্য সেগুলিই : (লাল ছাড়া) ঘন নীল, কমলা গাঢ় সবুজ, লেবু হলুদ কিংবা পিতল হলুদ, কালো, বেগুনী ইত্যাদি। এছাড়াও সেখানে আছে গেরুয়া, ধূসর, গোলাপী—ইত্যাদি ধরনের মিশ্র রঙ—লোক শিল্পে এদের ব্যবহার কম অবশ্য। এইসব রঙ অনেক সময়েই তিনি তৈরী করে নিতেন লৌকিক উপকরণ দিয়ে—প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রণের কাল থেকেই যা ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে হয়ত বা! অর্থাৎ, সেই হিংগুল, হরিতাল (এলামাটি), গেরি মাটি, চকখড়ি, চিমনীর ভুষো কালি, নীলের বড়ি, চুন, শ্যাওলা শুকানো গুঁড়ো ইত্যাদি। অন্য ধরনের রঙ ব্যবহার করতেন না তা নয়—তবে এইসব ঘরোয়া উপাদানের বর্ণ নির্মিতিতেও তাঁর প্রবণতা ছিল।

রেখার ক্ষেত্রে, প্রচলিত পট সুলভ সরু তুলির টান তাঁর ছবিতে কম। ছবির আয়তন প্রায়শই সাধারণ পট বা চৌকো পটের চেয়ে অনেক বড় বলে এটা সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। পটের ছবির মতন বলে পরিচিত হলেও, আসলে তাঁর তুলির টান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরা চিত্রের ঢঙের, পুরু এবং ঋজু এবং তীক্ষ্ণ; নমনীয়তা এবং দেহের ডৌলগুলি তার মধ্যে নেই প্রস্ফুট। কিন্তু পট বা সরা, উভয় ক্ষেত্রেই পুতলি বা মূর্তিগুলিকে প্রায় সময়েই সাদা কিংবা লেবু হলুদ পটভূতিতে আঁকা হয়, যামিনী বাবুর ছবিতে সেই ব্যাপারটি খুঁজে পাওয়া খুব সুলভ্য নয়। হলুদ বা সাদা রঙের 'রিলিফ' নেবার 'পোটো' রীতি তাঁর ছবিতে বিরল। অনেক সময়েই তাঁর বিখ্যাত রীতির পটলচেরা চোখের পুরোটাই থাকে সাদা; এর উৎসে আদিবাসী পুরাণ বৃত্তান্তানুসারী চক্ষুদান পটের অনুসৃতি থাকাই সম্ভব।

একই ছবি তিনি বহুবার এঁকেছেন। বিষ্ণু দে যদিও অবশ্য বলেছেন যে একমাত্র পিকাসো ছাড়া এত থীমের বৈচিত্র্য আর কোনো বরেণ্য শিল্পীর নেই, তবু এ নিয়ে বিতর্কে না গেলেও চলে। একই ছবি, একই থীমের পুনরঙ্কনটা অবশ্য পটশিলপীদের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সেই আদলটা যামিনীবাবুরও ছিল। পটশিল্পীদের ঐ প্রবণতাটি তিনিও আত্মস্থ করেছিলেন।

আলোচনা সাংগ করার মুখে তাঁর চিত্রকলার লৌকিক অনুষংগ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বিচার করাটা অবশ্য প্রয়োজন। কেউ কেউ তাঁর ছবিতে যদিও ফরাসী ইম্প্রেশানিস্টদের সংগে সূক্ষ্ম ভার সম্পর্ক খুঁজেছেন—শেজান, মাতিস তো বটেই এমন কি দ্যুরেরর সংগেও ভাবিক যোগাযোগ খুঁজে পেতে উৎসাহ বোধ করেছেন; প্রাগৈতিহাসিক পিতামহদের আদিম চিত্রধর্মকেও কল্পনা করেছেন কেউ আবার; নানা দেশের চিত্রশৈলীর সংগে আনুরূপ্য একত্রে এসে তাঁর ছবিতে বিশ্বজনীনতার প্রতিভাস এনেছে—এরকম ভাবনাও অপ্রাপ্য নয়। কিন্তু অস্টিন কোট্‌সের ভাষায় 'দ্য পেজান্ট প্যেন্টার' যামিনী রায়ের ছবির লোকধর্ম সম্বন্ধে শেষ কথা বোধহয় কে. জি. সুব্রহ্মণ্যমই বলেছেন : তাঁর ছবি হল, নব্য লোকশিল্প; খাঁটি লোকশিল্পের সহজাততা সেখানে পাওয়া যাবে না। সুতরাং যে কথা নিয়ে এ আলোচনা শুরু করেছিলাম, তাকে অবলম্বন করেই পালা সাংগ করি এবার : পটচিত্রের পুনরুজ্জীবন তিনি করেন নি—পটের ভাব ও আঙ্গিককে মানসলোকের আত্মীয় করে তুলে তিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন একটি মাত্রা সৃষ্টি করে গেছেন। তা' হল : লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রতি মমতা॥



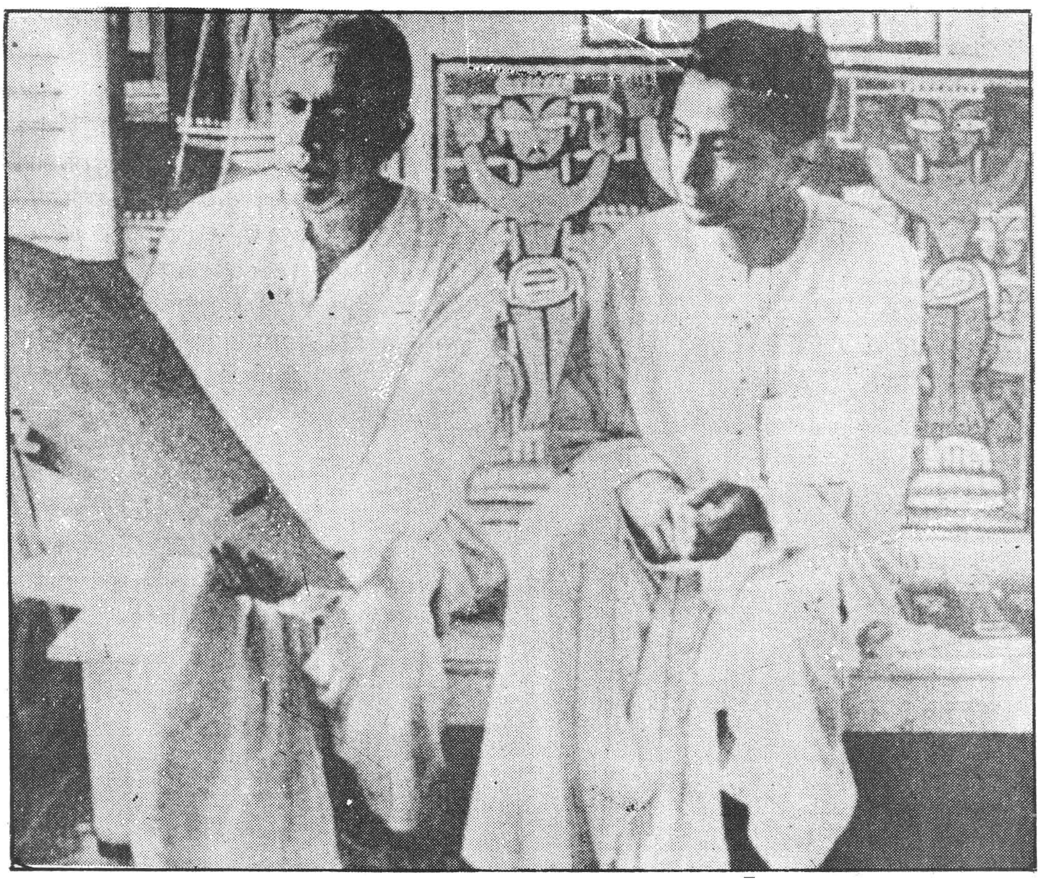


যামিনী রায় ও তাঁর লেখকবন্ধুরা

শ্রীঅরুণ সেন

যামিনী রায়ের জীবনে কবিসাহিত্যিকদের সংগে যোগাযোগ

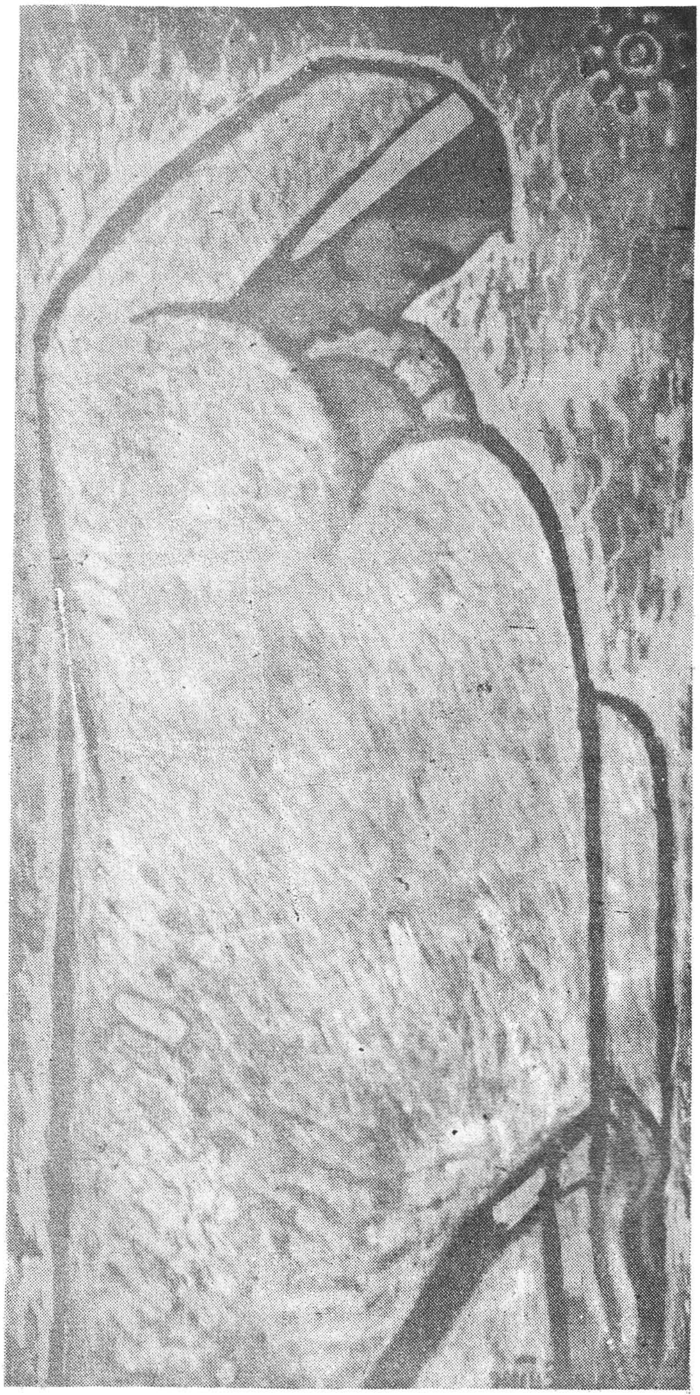
আজকাল অনেককেই খেদ করতে শুনি, শিল্পী অর্থাৎ যাঁরা ছবি আঁকেন বা মূর্তি গড়েন এবং সাহিত্যিক যাঁদের কাজ কাগজ কলম নিয়ে, এই উভয়ের কোনো সংযোগ নেই, কোনো বিনিময় নেই আমাদের দেশে, এখন। এই অভাববোধ কোনো-কোনো লেখকের যেমন, তেমনি কোনো-কোনো শিল্পীরও, একই সংগে সাহিত্যশিল্পের রসিক যাঁরা তাঁদের ত বটেই। এই প্রসংগে তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের কথা তোলেন।একদিকে এলুয়ার-আরাগঁ-র মত লেখক, অন্যদিকে মাতিস-পিকাসোর মত শিল্পী, এঁদের সংযোগ ও সম্মিলিত কর্মোদ্যোগের কথা। রদ্যাঁ গড়েছিলেন বালজাকের মূর্তি। রিলকে লিখেছিলেন এলিজি, পিকাসো-র ছবি দেখে। এমনকি, আমাদের দেশের কথাও যখন ওঠে, এই শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে একদিকে শিল্পী যামিনী রায়, অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে বা সে-সময়ের পরিচয় গোষ্ঠীর অনেক লেখকের সম্পর্কের বিষয়টি এসে পড়ে। শুধু সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত পরিচয়গোষ্ঠীই নয়, এরও বাইরে বুদ্ধদেব বসু বা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বা নাম করতে গেলে করা যায় এরকম অজস্র প্রধান বা অপ্রধান সমকালীন লেখকের সংগেও যামিনী রায়ের হৃদ্যতা এবং মানসিক যোগাযোগ ছিল। কিন্তু প্রশ্নটা এই: এইসব সম্পর্কের প্রকৃতিটা কীরকম? যামিনী রায়ের সংগে এই লেখকদের ব্যক্তিগত পরিচিতি ছিল, হয়ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই, তাঁরা তাঁর ছবি দেখতেন, হয়ত ছবি নিয়ে কখনো-কখনো আলাপ-আলোচনাও করতেন—মুখোমুখি আড্ডা, বাড়িতে যাওয়া-আসা, চিঠির লেনদেন, শিল্পীর প্রতি অপার সম্ভ্রম। সেটুকুই? না কি নিজেদের লেখাতেও তাঁর বা তাঁর শিল্পের অনুপ্রেরণা বা প্রভাব ঘটত? অর্থাৎ কোনোপ্রকার নান্দনিক কিংবা সৃজনশীল বিনিময়ও কি সম্ভব হয়েছিল? ইতিহাসের একেক পর্বে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যৌথ আন্দোলনের কথাও ত শুনেছি আমরা নানা দেশে। তেমন কিছু কি ঘটেছিল যামিনী রায় ও তাঁর লেখকবন্ধুদের সম্পর্কসূত্রে? প্রশ্নটা অবশ্য একতরফাই নয়, যামিনী রায়ও সমকালীন সাহিত্যের সংগে কতটুকু যুক্ত ছিলেন বা তাঁর



যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে

শিল্পসাধনাতেও লেখকবন্ধুদের সঙ্গে এই যোগাযোগ সামান্যতম ছাপ ফেলত কিনা সে-প্রশ্নকেও অস্বীকার করা যায় না। এইসব প্রসঙ্গই আমার আলোচ্য।

তবে যামিনী রায়ের জীবনেতিহাস আমার বিষয় নয়। তাই বেলেতোড় গ্রাম থেকে প্রথম কলকাতায় এসে তিনি কী করেছিলেন বা কী ভেবেছিলেন কিংবা শিক্ষানবিশি পর্বে বা তারও পরে কীভাবে কলকাতার বিভিন্ন গুণীব্যক্তিদের ও লেখকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তার কথা উঠছে না। বেশ কয়েকজনের কথাই ত আমরা শুনেছি। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তিনি সামান্য ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।সেটা অবশ্য দুই শিল্পীরই বিনিময়। যামিনী রায় নিজে যেমন রবীন্দ্রনাথের ছবির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন প্রবন্ধ লিখে—একদিক থেকে সেটাই ছিল বোধহয় "নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে" প্রথম স্বদেশী "স্বীকৃতি", অন্তত রবীন্দ্রনাথ তা-ই মনে করেছিলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল ইঙ্গিতপূর্ণ অনুমোদন যামিনী রায়ের ছবির বিষয়ে, অন্তত যামিনী রায় তা-ই মনে করতেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জলধর সেন, কল্লোল-এর দীনেশরঞ্জন দাশ, নাট্যজগতের যোগেশ চৌধুরী বা শচীন সেনগুপ্ত : এরকম অনেকের নামই আমরা এলোমেলো শুনি যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। আমার আলোচ্য তাঁরা নন।



আমার আলোচ্য শিক্ষানবিশি বা বিভিন্ন পরীক্ষা ও সংকট পেরিয়ে, বর্জন ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে, তিনি যখন নিজের শিল্পজগতে প্রবেশ করলেন, সেই নান্দনিক প্রবেশভূমিতে বা অভিযানে তাঁর সঙ্গী ও সমর্থক হয়েছিলেন যেসব অনুরাগী লেখকবন্ধুরা, তাঁরা এবং সেক্ষেত্রেও নান্দনিক বিনিময়ের প্রকৃতিটাই যেহেতু আমার দ্রষ্টব্য, তাই সেই সংযোগের ইতিহাস-বর্ণনায় কালানুক্রমকে অনুসরণ করার দায়ও আমার নেই।

এদিক থেকে তিরিশের দশকই হল সেই সময়। যামিনী রায় এর কিছু আগে থেকেই নিজের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। পাশ্চাত্য রীতির তেলরঙে আঁকা, পোর্ট্রেট আঁকা ছেড়ে দিয়ে—লোকশিল্পের রূপাবয়বের শুদ্ধতাকে নিজের মত আত্মসাৎ করে। এটা যে একটা বিরাট ঝুঁকি সে-বিষয়ে সকলেই একমত। এর আগে পোর্ট্রেট-আঁকার সাফল্যে তিনি জীবিকাকে সুনিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। শুধু যে পোর্ট্রেট আঁকা বন্ধ করে বা কমিয়ে দিয়ে তিনি আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে গেলেন তা-ই নয়—শিল্পের দিক থেকেও পৌঁছলেন নিঃসঙ্গতায়। সে-সময়ে ওই ছবির রুচির গ্রাহ্যতাও ছিল অনিশ্চিত। বেঙ্গল স্কুল ও তার প্রভাবে ছেয়ে ছিল শিল্পের জগৎ। তিনি সে-পথেও গেলেন না। পাশ্চাত্য ও ওরিয়েন্টাল দুটো পথই তাঁর নয়। যামিনী রায়েরই কথা উদ্ধৃত করে সুন্দর বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু: "পটে-আঁকা যে আঙুরগুচ্ছে পাখিরা এসে ঠুকরে যায় সে আঙুরফলের রস নেই—এই কথাটা অল্পবয়সেই তিনি অনুভব করেছিলেন, এবং এও বুঝেছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথের ইশকুল, আমাদের তথাকথিত ইন্ডিয়ান আর্ট—যেখানে 'কাপড়টা আঁকার ইচ্ছে আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই'—সেটাও ঠিক পথ নয়।" যামিনী রায়ের পরবর্তী লেখা বা সাক্ষাৎ-আলাপ পড়ে মনে হয়, নিজের মধ্যেও যে সংশয় একেবারে ছিল না, তা নয়। "আঁকা ছাড়ব কি ধরব, কী ছবি আঁকব, তাও তখনো জানা হয়নি"—বলেছিলেন তিনি। এই অবস্থা পেরিয়ে এসেছিলেন তিরিশে।

১৯৩১-এ বেরয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচয়' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র সম্পাদনায়। কিছু পরেই সুধীন্দ্রনাথের নিজের এবং পরিচয়গোষ্ঠীর অনেক লেখকেরই প্রায় একটা উৎসবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যামিনী রায়ের বাগবাজারের বাড়িতে নিয়মিত ছবি দেখতে যাওয়া। কীভাবে এবং কী কারণে এটা ঘটল তা নিয়ে সন্দেহ পোষণও করেছেন কেউ-কেউ সে-সময়ে এবং পরবর্তীকালে। এ কি নিছক নান্দনিক আবিষ্কার, না কি অন্য কোনো প্ররোচনা রয়েছে পেছনে? এঁদের মধ্যে একজন অবশ্য ঠিক বাংলাভাষার



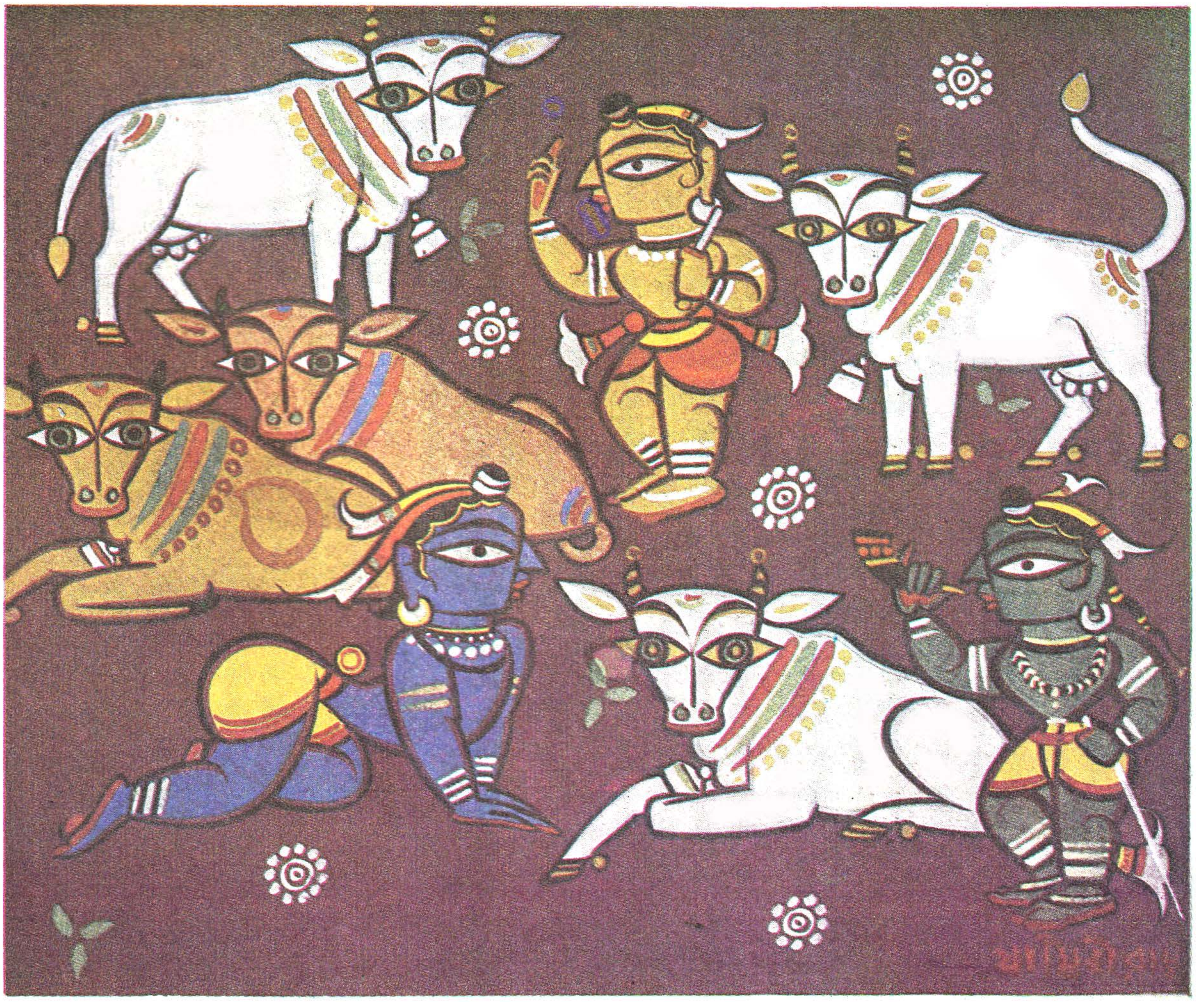
যামিনী রায়

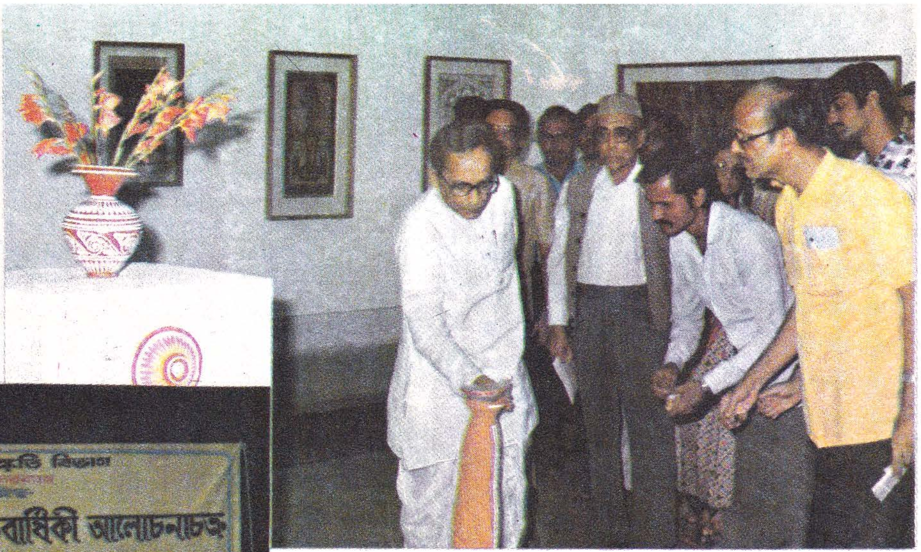
যামিনী রায়ের চিত্রকলা



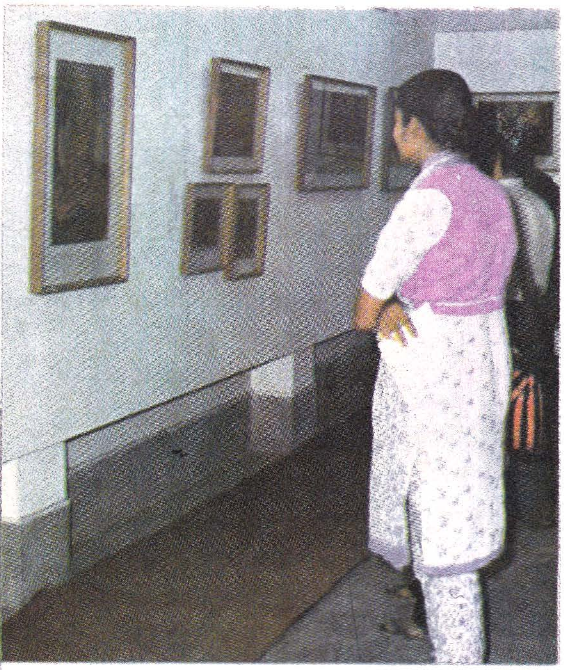


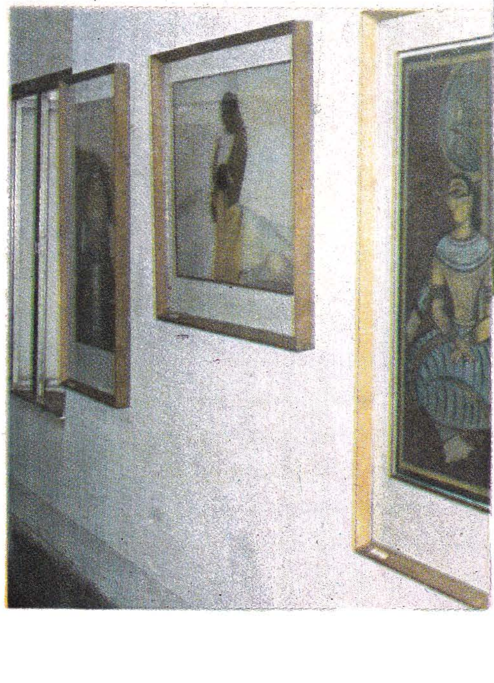

যামিনীরায়





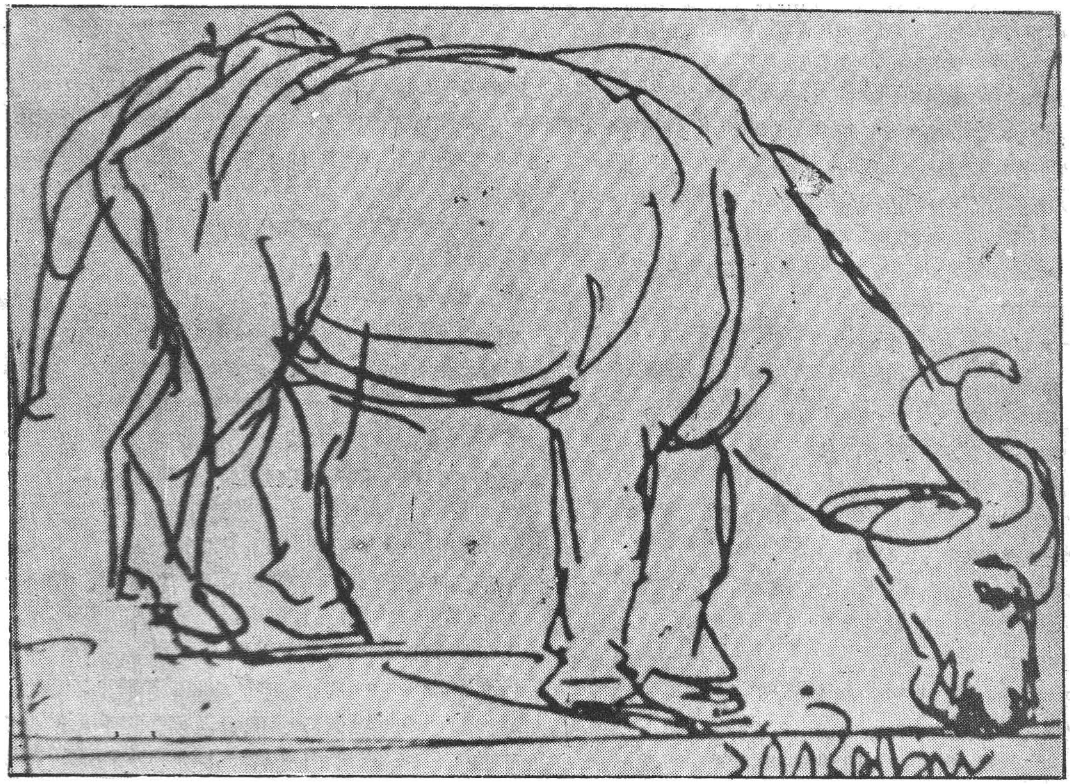






২৮ ও ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭ কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে যামিনী রায় জন্মশতবার্ষিকী আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জ্বেলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (উপরে), আলোচনা সভায় ভাষণ দিচ্ছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী (মাঝে বাঁদিকে)। প্রদর্শনীর দুটি অংশ।

ছবি : সৃমন্ত পত্রনবীশ



লেখক নন, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং পরিচয়-এর আড্ডার সংগে জড়িত : বিদগ্ধ শিল্পরসিক শাহেদ সুরাওয়ার্দি। তিনিই এঁদের মধ্যে প্রথম যামিনী রায়কে নিয়ে পুরোদস্তুর একটা প্রবন্ধ লিখলেন ১৯৩৭-এর একটি প্রদর্শনীকে উপলক্ষ করে। পরিচয়গোষ্ঠীর অন্যান্য অনেকেই আলাদা করে যেমন, তেমনি পরিচয়-এর একজন হিসেবেও যামিনী রায়ের অনুরাগী হিসেবে গণ্য হচ্ছিলেন। যামিনী রায়ের নতুন ছবি ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে—ধীরে-ধীরে এবং ছিটুকা বিক্ষিপ্তভাবে। পরিচয়গোষ্ঠীর লেখকেরা সুধীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বা কখনো এককভাবেই মাঝে-মাঝে যে উপস্থিত হচ্ছেন সেখানে—সেটা প্রায় 'খবর' হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে সেকালের কলকাতায়। সে-সময়ের অনেকের লেখায় বা স্মৃতিচারণে তার উল্লেখ দেখতে পাই। যামিনী রায়ের নতুন ছবির স্বীকৃতি বা মর্যাদালাভের দিক থেকে সেটা নিশ্চয়ই খুব কাজের হয়েছিল।

পরিচয়-এর সাপ্তাহিক আড্ডায় যামিনী রায়ের ছবির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কথাবার্তা প্রায় নিয়মিত হত ১৯৩৮ থেকে ৪০ পর্যন্ত—শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের পরিচয় এর ডায়েরি-'তে তার সাক্ষ্য আছে। বহু লেখকই তাতে যোগ দিতেন। কখনো-কখনো যামিনী রায় নিজেও উপস্থিত থাকতেন। শিল্প নিয়ে তাঁর মতামত বা নিজের ছবি নিয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা গভীর শ্রদ্ধায় অনুধাবন করতে চাইতেন লেখকেরা। ১৯৪৩-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজেও লিখলেন যামিনী রায় বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ এবং সেটি ও ইংরেজিতে। লংম্যান্স একটি অ্যালবাম ছাপবেন কথা ছিল, তারই ভূমিকা হিসেবে। অ্যালবাম শেষ পর্যন্ত বের হয়নি, কিন্তু লেখাটি হয়ে গিয়েছিল। ছাপা হল 'লংম্যান্স মিসেলিনি'-তে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়াও পরিচয়-এর অনেক লেখকেরই লেখায়, স্মৃতিচারণে, কবিতায় যামিনী রায়ের প্রসংগ এসেছে—নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণ সান্যাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সমর সেন পর্যন্ত অনেকেরই।

পরিচয় এর আরেকজন সদস্য যাঁর সংগে যামিনী রায়ের সম্পর্ক প্রবাদে পরিণত হয়েছে, তিনি বিষ্ণু দে। তাঁর নিজেরই স্মৃতিচারণ অনুসারে, যামিনী রায়ের প্রদর্শনী দেখতে শুরু করেছেন তিনি তরুণ বয়স থেকেই, তিরিশ শুরু হওয়ারও কিছু আগে। কিন্তু পরিচয়-এর অনুকূল হাওয়ায় সেই রুচি প্রশ্রয় পেতে থাকল সুধীন্দ্রনাথেরই নেতৃত্বে। তিরিশের মধ্যপর্ব থেকে যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিগত পরিচয় গাঢ় হতে শুরু করেছে। উভয়ের মধ্য দীর্ঘ পত্রবিনিময়ও শুরু হয়েছে তার কিছু পরে-পরেই। এই আমৃত্যু ছেদহীন যোগাযোগ শুধু বন্ধুত্বের নয়, শিল্পের ইতিহাসের দিক থেকেও স্মরণীয়। আশ্চর্যের বিষয়, যামিনী রায় সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র প্রথম প্রবন্ধও ইংরিজিতে। বন্ধু জন আরউইনের সহযোগিতায় লেখা। ১৯৫২ সালে বেরয় এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এ ছাড়াও সারা জীবন ধরে যামিনী রায় বিষয়-এ অজস্র স্মৃতিমূলক কিংবা সিরিয়স শিল্প-আলোচনা তিনি করে গেছেন, যা নিয়ে পরে আস্ত একটি বই হতে পেরেছে। যামিনী রায়ের ছবি তাঁর একাধিক বিষয় হয়েছে এবং আছে যামিনী রায়কে নিয়ে বা যামিনী রায়কে নিবেদিত কবিতাও। যামিনী রায়ের সমগ্র শিল্পব্যক্তিত্বই এসেছে তাঁর চিন্তার এবং কাব্যের অভিজ্ঞতা হিসেবে। ছিন্ন উচ্চারণ বা বাকপ্রতিমা হিসেবেও বারংবার। ব্যক্তিগত জীবনের সংগে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁরা জানেন, কথায় বার্তায় জীবনযাপনের উপকরণে বা পরিবেশে কীভাবে যামিনী রায়কে সংগে নিয়ে যেন তিনি বাস করতেন। যামিনী রায় বিষয়ে যে লেখক সবার্ধিক আচ্ছন্ন, তিনি যে বিষ্ণু দে সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কী তার তাৎপর্য তা আলোচনার শেষাংশে উঠবে, আপাতত এই তথ্যটি জেনে নেওয়াই যথেষ্ট।

যে-অর্থে 'পরিচয়' "গোষ্ঠী", 'কবিতা' সে-অর্থে তা ছিল না। বুদ্ধদেব বসু একাই, বা বলা ভাল সপরিবারে যামিনী রায়ের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তিরিশেরই উপান্তে। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'আমাদের কবিতাভবন' বইতে লিখেছেন : "আজ হিশেব করে দেখছি, যামিনী রায়ের সংগে প্রথম পরিচয়ের সময় তিনি পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন বা সবেমাত্র পেরিয়ে এসেছেন।" যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭-তে। সুতরাং তারপর পঞ্চাশ ছোঁয়া বা পেরনোর অর্থ ১৯৩৭-৩৮। সে সময় থেকেই শিল্পীকে খুব কাছাকাছি দেখেছিলেন

বুদ্ধদেব। সেই অভিজ্ঞতারই প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁর ওই রচনায়। পড়তে-পড়তে বোঝা যায়, দক্ষিণ কলকাতাবাসী বুদ্ধদেবের কাছেও বাগবাজারের গলিতে যামিনী রায়ের কাছে নিয়মিত আসা কতটা আনন্দের ব্যাপার ছিল।তিনি অনুধাবন করতে পারতেন যামিনী রায়ের জীবনযাত্রার ও শিল্পসাধনার আদর্শ এবং নিজের সঙ্গে মিল না থাকলেও সম্ভ্রম অনুভব করতেন। বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গেও যামিনী রায়ের পত্রালাপ দীর্ঘদিনের এবং শুনেছি তার সংখ্যাও বিপুল। বুদ্ধদেবের কবিতাতেও যামিনী রায় আসেন, ১৯৪২-এ।

আমরা সবাই প্রতিভারে ক'রে পণ্য
ভাবালু আত্মকরুণীয় আছি মগ্ন,
আমাদের পাপে নিজের জীবনে জীর্ণ
  করলে, যামিনী রায়।
জীবনের রসে শিল্পেরে দিলে প্রাণ,
জ্বালালে জীবন শিল্পের শিখা থেকে।
তুমি জয়ী হ'লে আপনার প্রাণ নিঃশেষে ক'রে দান,
আমরা পতিত খানিকটা হাতে রেখে।

পাপের প্রাচীর দিকে-দিকে হবে ভগ্ন,
আবার আসবে শিল্পীর শুভলগ্ন–
পুঁথিতে রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রাণের স্বপ্ন রচনা ক'রে
  আমাদের দিন যায় :
পুঁথি ফেলে তুমি তাকালে আপন গোপন মর্মতলে,
ফিরে গেলে তুমি মাটিতে, আকাশে, জলে।
স্বপ্ন-লালসে অলস আমরা তোমার পুণ্যবলে
  ধন্য, যামিনী রায়। ('যামিনী রায়', 'এক পয়সায় একটি')

কবিতাটির টীকা হিসেবে সম্পাদক নরেশ গুহ লিখেছিলেন : "সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন, এদের মধ্যে সমাজচেতনার মত একধরনের সাময়িক প্রবণতার ছাপ আছে যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসুকেও ক্ষণিকের জন্য নাড়া দিয়েছিল।" পরে, সত্যিই বুদ্ধদেবের আর এই মনোভাব ছিল না যামিনী রায় বিষয়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ঔপন্যাসিকের সঙ্গে যামিনী রায়ের যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল, তা ভৌগোলিক হলেও উভয়ের প্রকৃতির নানাবিধ মিলের দিক থেকে এই সম্পর্ক খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। তারাশঙ্কর তাঁর আত্মজীবনী 'আমার সাহিত্য-জীবন' বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের গোড়াতেই বলেছেন যামিনী রায়ের কথা। যখন তিনি বাগবাজারের ভাড়াবাড়িতে উঠে এলেন, তখন তিনি নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবেই পেয়েছিলেন তাঁর যামিনীদাদাকে। সময়টা বলেছেন 'ধাত্রীদেবতা' প্রকাশের (১৯৩৯) পর এবং 'কালিন্দী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের (১৯৪০) আগে। অর্থাৎ সেই ১৯৩৯-৪০-এরই কথা। তারাশঙ্কর লিখেছেন : "আমার সামনেই আমার বাসার উঠানের দেওয়ালের ওপাশেই সাধক-শিল্পী যামিনী রায়,– আমার যামিনীদাদার বাড়ি। যামিনীদাদা জীবন-সাধনায় নিদারুণ অভাব দুঃখ সহ্য করে অবিচলচিত্তে হাসিমুখে আমার চোখের সামনে এগিয়ে চলেছেন।"

একদিকে উভয়ের মধ্যে মিল অনেক, অন্তত তারাশঙ্কর নিজেই তা মনে করেছিলেন। এবং মনে করেছিলেন তারাশঙ্কর বিষয়ে আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচকও। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য লিখেছেন : "অসাধারণ নিষ্ঠায় সাহিত্যচর্চাকে শৌখিনতা থেকে বিমুক্ত করে নিয়ে, তাকে দিলেন ব্রতচর্যার চেহারা আর এইভাবে আত্মসংগঠন ও আত্মবিকাশের পথ বানালেন তারাশঙ্কর। এই সূত্রে যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ে। বহু বিষয়ে এঁদের মিল…।"

উভয়েই মূলত গ্রামের মানুষ। বীরভূমের লাভপুর এবং বাঁকুড়ার বেলেতোড়। উভয়ের মধ্যেই গ্রামীণ মূল্যবোধ ও আদর্শ, সময়ে-সময়ে যা বিজ্ঞানবিরোধী সংস্কারেও রূপ নেয়, তার প্রকোপ প্রবল। উভয়েই লড়াই করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছেন স্বকীয়ভাবে। তারাশঙ্কর নিজের বিষয়ে বলেছেন : "আমার জীবনসাধনায় তখন ধ্যানযোগের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা নেমেছে।" ঠিক তখনই যামিনী রায় সম্পর্কেও বলেন, "স্তব্ধ শান্ত কঠিন। উল্লাসের বন্যাই আসুক আর বিপর্যয়ের ঝড়ই আসুক, অক্ষয়বটের মত মানুষটি স্থির।"

আবার অন্যদিক থেকে দেখি, বাইরের বিচারে ওই গ্রামীণতা সত্য হলেও, ভেতরে-ভেতরে তাঁরা যথেষ্ট নাগরিক। যামিনী রায় সম্পর্কে বিষ্ণু দে একদা লিখেছিলেন, তিনি একাধারে গ্রামীণ মানুষ যেমন তেমনি শহরের মানুষও– সে-কথাও কি তারাশঙ্কর সম্পর্কেও বলা যায় না? গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবনযাপনের জন্য উভয়েই হাহুতাশ করেন, অথচ শহরেই রয়ে যান। প্রথম পরিচয়ের দিনেই যামিনী রায়ের এই উপদেশ তাঁর মনে গেঁথে যায় : "শ্মশান না হলে শব-সাধন হয় না। প্রত্যেক সাধনায় সাধনপীঠের প্রয়োজন হয়। এ যুগে কলকাতাই হল সাহিত্যের শিল্পের সাধনপীঠ। এখানে আসুন, কষ্ট করুন, এক বেলা খেয়ে থাকুন–তবেই পাবেন।" নাগরিক আত্মসচেতন জটিলতা না-থাকলে যে প্রকরণগত পরীক্ষা যামিনী রায়ের ছবিতে কিংবা যে আঙ্গিক ভাঙাগড়া তারাশঙ্করের উপন্যাসে, তা কি সম্ভব ছিল?

দীর্ঘকাল তারাশঙ্কর যামিনী রায়ের সাহচর্য পেয়েছেন। যুদ্ধের পরে শিল্পীর দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি করে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে উভয়ের যে মিল বা অবিচ্ছিন্নতার অনুভব, তার পেছনে যামিনী রায়ের অনুপ্রেরণা কতখানি এবং কতদূর তা স্পষ্ট করে না বললেও স্মৃতিকথায় যামিনী রায়-প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর শেষ করেছেন এইভাবে : "আজ অকপটে এই প্রসঙ্গে স্বীকার করব–সকলের কাছে জানাব যে, আমার মত ভক্ত তাঁর বোধ করি নেই। তাঁর শিল্পের ভক্ত, শিল্পী যামিনী রায়ের আমার থেকে অনেক বড় ভক্ত আছেন, কিন্তু মানুষ যামিনী রায়ের, সাধক যামিনী রায়ের ভক্ত আমা থেকে বড় কেউ নয়।"

সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে ও তারাশঙ্কর–যামিনী রায়ের অন্তরঙ্গদের মধ্যে এই চারজন লেখকের কথাই যে অনিবার্যত উঠে আসে, তার সুবিধা এই, এঁরা যে শুধু সমকালীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের মধ্যে পড়েন তাই নয়, এঁদের ব্যক্তিস্বরূপ ও লেখকস্বরূপের বিভিন্নতার কারণে শিল্পী ও লেখকের সাযুজ্যের বিভিন্ন মাত্রা ও সম্ভাবনাটা বুঝে ওঠা যায়।

এক ব্যাপারে সকলেই একমত তা হল, যামিনী রায়ের জীবনযাপন ও শিল্পচর্চায় যে শ্রম ও নিয়মানুবর্তী নিষ্ঠা তার মহিমা। আগেই ত পড়েছি, তারাশঙ্করের সাহিত্যচর্চায় আছে "ব্রতচর্চার চেহারা"। সেই বোধেই তিনি নিজে লেখেন "সাধক-শিল্পী যামিনী রায়" এবং শিল্পী সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "বাড়ির মধ্যে চলত তাঁর শিল্পসাধনা।" বুদ্ধদেব বসু, যাঁর সঙ্গে নানা ব্যাপারেই যামিনী রায়ের পার্থক্য মৌলিক, তিনিও কিন্তু দাবি করেছেন শিল্পী বা লেখকের জীবনযাপনে ব্রতপালনে তিনি যামিনী রায়ের সমধর্মা। লিখেছেন, " যামিনী রায়ের কাছে পেয়েছিলাম একটি আদর্শ–রচনার নয়, সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার কিছুই মেলে না–দৈনন্দিন জীবন যাপনের। আমার নিজেরও ছিল স্বাভাবিক ঝোঁক সেদিকে…। 'ব্রতপালনের মত দিনযাপন' যে-কথাটা আসলে বোধহয় রবীন্দ্রনাথের,… আমি যামিনী রায়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ঐ যে তিনি ভোরে উঠে কাজে বসে যান এবং নিজেকে ক্লান্তির সীমায় টেনে না -নিয়ে থামেন না, ঐ যে তাঁর পরিশ্রম চলে অবিরাম এবং বিনোদবিহীন ও বিক্ষেপহীন–ঘটনার সব উত্থানপতন ও সাময়িক সব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সমতালে তাঁর এই নিয়মনিষ্ঠা আমাকে উত্তরোত্তর অধিকতর মুগ্ধ করেছে।" নিজের সম্পর্কে বলেন, "কিছুটা বয়সের চাপে, কিছুটা দৈব অথবা দুর্দৈবের জন্য, আর অনেকখানি সচেতন

চেষ্টায়, আমার মনে হয়, আমার দিনগুলিকে আমি সেই ছাঁচে গড়ে তুলতে পেরেছি...।" প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য তাঁর ওই তারাশঙ্কর-বিষয়ক প্রবন্ধেই লিখেছিলেন, মনে আছে: "ভাস্কর বা শিল্পীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন কোনো কবি বা সাহিত্যিক-সংস্কৃতির ইতিহাসে এরকম ঘটনা বিরল নয়। আমরা জানি, রদ্যাঁ-র প্রাত্যহিক কাজ করার দৃষ্টান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, নিজেকে পালটেছিলেন রিলকে। হয়ত যামিনী রায়ের এই ব্রতপালনের মত দিনযাপনের উদাহরণ থেকে তারাশঙ্কর প্রেরণা পেয়েছিলেন—যেমন পেয়েছিলেন তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর লেখক, বুদ্ধদেব বসু।" সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে হয়ত জীবন পালনের বিন্যাসের এই সহধর্মিতার কথা ওঠে না। কিন্তু বিষ্ণু দে-ও বারবার বলেছেন তাঁর লেখায় ও আলাপচারিতে যামিনী রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিজের কাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার কথা।

কিন্তু, এর বাইরে, জীবনযাপনের ব্যাপারে মুগ্ধতা কিংবা ছবি দেখতে ভাল-লাগা মন্দ-লাগার বাইরে, যামিনী রায়ের সঙ্গে আলোচ্য লেখকদের নান্দনিক সংযোগ কতখানি? তাঁদের লেখার দিক থেকে কিংবা যামিনী রায়ের আঁকার দিক থেকে কতখানি সৃজনশীল এই বন্ধুত্ব?

সুধীন্দ্রনাথ ও পরিচয়-গোষ্ঠীর যামিনী রায় বিষয়ে মগ্নতা সে-সময়ে অনেককেই বিস্মিত, এমনকি কাউকে-কাউকে সন্দেহগ্রস্ত করেছিল। কারণ, যামিনী রায় যিনি কথায়বার্তায় গ্রামীণ জীবনাদর্শের ভক্ত এবং চিত্রকর্মে কোনো-না-কোনো অর্থে গ্রামীণ স্বদেশকে রূপ দেওয়াতেই উৎসাহী—তিনি কী করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পশ্চিমী আধুনিকতায় দীক্ষিত এই লেখকদের আকৃষ্ট করলেন? এ সন্দেহ অনেকের মধ্যেই ছিল। তারাশঙ্কর ত স্পষ্টতই কটাক্ষ করেছেন—'যে-কথা তিনি [যামিনী রায়] বলেন, সে-কথা ইংরেজি-প্রভাবান্বিত ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষের উপলব্ধি করা অসম্ভব।" এমনকি গোপাল হালদার ১৯৪৫ সালে লেখেন, "এ দেশেরও যাঁরা পরিশীলন্-কুশল রসিক—সর্বাপেক্ষা বিজাতীয়—তাঁরাই হলেন যামিনী রায়ের শিল্পের সর্বাপেক্ষা বেশি সমজদার! তাঁরা অনেকেই জাতি চিত্ত, জাতীয় ভাবধারা থেকে বিচ্যুত—যামিনী রায়ের মতে, তাঁদের উপরই পরধর্মের প্রভাব পড়েছে বেশি। তাঁর এই সর্বাপেক্ষা বেশি 'জাতীয় শিল্পের' এদেশে কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি গুণগ্রাহী তাঁরাই। কিন্তু তাঁদের এই উৎসাহ খাঁটি, না মেকি? হয়ত দুইই—কতকটা রোজার ফ্রাই, ব্লাইব, বেল প্রমুখদের শিল্প-নজিরের ফলে তাঁদের এ দৃষ্টি জন্মেছে, কতকটা এদেশে পিকাসো-মাতিস আবিষ্কারের নেশায় তাঁরা উৎসাহী।" কেউ-কেউ আবার মনে করেছেন: অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু কিংবা তাঁদের প্রভাবে গড়ে-ওঠা শান্তিনিকেতন-স্কুলের বিরুদ্ধে যামিনী রায়কে উপস্থাপিত করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। একথা ত সত্যিই, 'পরিচয়'-এর কুড়ি বছর' বইতে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন: "পরিচয়-এর অধিবেশনে কী বিষয়ে না আলোচনা হত! তবে একটি শিল্প-প্রসঙ্গের কথা মনে পড়ে।... সুধীন ও শাহেদ নন্দলালবাবুর সঙ্গে যামিনী রায়ের তুলনা করে প্রায় জোর গলায় বলত যামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠতার কথা। তাঁদের একটি যুক্তি ছিল যে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বেশির ভাগ সময় ছবি এঁকেছেন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয় নিয়ে, কিন্তু যামিনীবাবুর ছবি হল বিশুদ্ধ ছবি—সাহিত্যিক ছবি নয়।"

আধুনিক শিল্পে ভারতীয়ত্ব ও পাশ্চাত্যের এই বিভাজনের—এই ধরনের বিভাজনের—অবাস্তবতা এতদিনে স্পষ্ট হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে, তা ওই ১৯৪৩ সালেই, তীক্ষ্ণভাবে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যামিনী রায়ের শিল্পীজীবনের শুরু "ইওরোপীয় রীতির সার্থক পোর্ট্রেট-আঁকিয়ে হিসেবেই" এবং যামিনী রায়ের শিল্পের স্বাদেশিকতার মহিমা বুঝতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক রুচি প্রতিবন্ধক নয়, হয়ত বেশিই সহায়ক।

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বা শান্তিনিকেতনী আবহাওয়া ইত্যাদি বলতে যা বোঝানো হত, তার বৈপরীত্যে যামিনী রায়কে দাঁড়-করানোর মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটাই বাড়বাড়ি ছিল। হয়ত অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের বিচারে পরিচয়-গোষ্ঠীর কিছুটা সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতাই তাতে প্রমাণিত। কিন্তু ওরিয়েন্টাল স্কুলের নানাবিধ শাখাপ্রশাখা এবং ধূসর অস্পষ্ট চিত্রণের ঐতিহ্য যে আধুনিক সাহিত্যের উদ্‌গাতা এই এলিয়ট-ভক্তদের বিরোধী করে তুলেছিল এবং যামিনী রায়কে তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের আধুনিক নন্দনদৃষ্টির পরিপূরক হিসেবে, তার যাথার্থ্য ও তাৎপর্যকেও বুঝতে হবে। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্টই দেখিয়েছেন আধুনিকের কাছে কোথায় সেই পরিপূরকতা। তিনি দেখিয়েছেন, যামিনী রায়ের শিল্পজীবন থেকে এটাই গ্রহণীয় যে, "যে-কোনো অবস্থাতেই অনুসন্ধিৎসু পরীক্ষায় যামিনী রায়ের আগ্রহ সমান দুর্দম এবং একটি বিষয়কে নির্বাচিত করার পর তিনিও সেটাকে ভেঙে, দুমড়ে, বিবিধ সংস্কার ঘটিয়ে একটির পর একটি পুনরাবৃত্ত রূপান্তরের পথে কয়েক মাসের মধ্যে যেন একটা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শেষ করেন।" তাই যদি হয়, মাতিস ও পিকাসো-র কাছে যামিনী রায় কী করে অগ্রাহ্য হবেন? সুধীন্দ্রনাথের লেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে কী করে গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়ে স্বদেশী বাস্তব তার নিজস্বতায় আকার পেয়েছে যামিনী রায়ের শিল্পে—যদিও তাঁর সমালোচনাও আছে: কেন সে-স্বদেশ সাম্প্রতিক বিক্ষোভ পর্যন্ত পৌঁছয় না।

কিন্তু ওই প্রবন্ধে সমগ্রতার রুচিকে গ্রহণ করার যে নির্দিষ্ট চারিত্র আছে, তা কি সুধীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিশীলতায় চরিতার্থ করেছেন? বলতেই হয়, তাঁর অসামান্য চিন্তার সাক্ষ্য 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধের যেমন রূপায়ণ ঘটেনি তাঁর নিজের কবিতায়, তেমনি 'যামিনী রায়' বিষয়ক প্রবন্ধে যে আশ্চর্য উপলব্ধি, তার কোনো ছাপ নেই তার সামগ্রিক চিন্তায় বা নন্দনদৃষ্টিতে।

বুদ্ধদেব বসু-র মধ্যে অবশ্য এই দ্বিধা নেই। সেদিক থেকে তাঁর রুচি দেশকাল নিরপেক্ষ হোক, হয়ত সেটাই তাঁর প্রত্যাশিত। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন: "যামিনী রায়ের ছবির একজন প্রধান ভক্ত হিসেবে আমি গণ্য হতে পারি না, তাঁর চিত্রকলা যে আমাকে অত্যন্ত বেশি নাড়া দিয়েছে তাও নয়। 'সুন্দর' নিশ্চয়ই নয়নমোহন...কিন্তু বড় যেন শান্ত ও সমতল; আমি পাই না তাতে সেই চাঞ্চল্য বা আবেগের ঘাতপ্রতিঘাত, যা সব শিল্পের কাছেই আমার প্রত্যাশা—অথবা তা পাই শুধু মাঝে-মাঝে...।" "কিছুদূর পর্যন্ত আমি চলতে পারি তাঁর সঙ্গে।"

এমনকি তারাশঙ্কর যাঁর সঙ্গে যামিনী রায়ের জীবন ও জীবনযাপনের বাহ্য মিল অনেকখানি, তিনিও আমরা দেখেছি, শিল্পীর সাধক-জীবনের প্রতি যতটা অনুরক্ত, শিল্পের ভক্ত ততটা নন। হয়ত, একদিক থেকে বলা যায়, শেষপর্যন্ত যামিনী রায়ের মত অনুভবের জটিলতার পথ তাঁর নয়—যে জটিলতা বোঝা যায় যামিনী রায়ের চিঠিপত্রের অস্থির ভাষায়, জীবনযাপনের ও শিল্পভাবনার বিচিত্র প্রকাশে। তিনি তাই কিছুতেই বুঝতে পারতেন না, কী করে যামিনী রায় যিনি রাত্রে খাঁটি দেশীয় আসরে যোগ দিতেন তারাশঙ্কর ও যোগেশ চৌধুরীর সঙ্গে, তিনিই তার আগে সন্ধ্যায় কেন সময় কাটান সুধীন্দ্রনাথ ও পরিচয়গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে। তিনি অপ্রসন্নভাবে লক্ষ করেন, বামপন্থীরা যামিনী রায়কে "ঘিরে" রাখে। স্পষ্টতই লেখেন, "যামিনীদাদার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমার মতভেদ আছে।" যামিনী রায় একবার তাঁকে বলেছিলেন, "ভায়া, বিয়োগান্ত রচনা আর করবেন না। সংসারে দুঃখকষ্টের অবধি নাই। সে দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন নিংড়ে নিচ্ছে। তার মধ্যে আনন্দের কথা বলুন, আশার কথা বলুন।" এ-কথাতে যেমন যামিনী রায়কে চেনা যায়, তেমনি তারাশঙ্করের প্রতিক্রিয়াতেও স্পষ্ট হয় উভয়ের ব্যবধান। তারাশঙ্কর লেখেন, "আমি এ নিয়ে তখন কত তর্কই করেছি! তিনি বলতেন, বোঝাতে ত পারছি না।"

সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, তারাশঙ্কর—এই তিন দিকপাল সাহিত্যিকই যামিনী রায়ের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিংবা তাঁর চিত্রকলা ও চিত্রদর্শন সম্পর্কে কমবেশি যতই শ্রদ্ধাশীল হোন না কেন, এ বিষয়ে শেষপর্যন্ত আমরা নিঃসংশয় হয়ে উঠি, তাঁদের নিজের-নিজের সাহিত্য বা জীবনদর্শনের দিক থেকে যামিনী রায়ের সঙ্গে কোনো সৃজনশীল বিনিময় বা নান্দনিক সংলগ্নতা ছিল না। এই বিনিময় ও সংলগ্নতা বোধহয় একজন লেখকের কাছেই সত্য হয়ে উঠেছিল—

তিনি বিষ্ণু দে। দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা পারস্পরিক গুণগ্রাহিতার কথাই বলছি না–বলতে চাই বিষ্ণু দে-র কবিতা ও নান্দনিক দৃষ্টির অভিযানে যামিনী রায়ের সামগ্রিক ভূমিকার কথা, সাহচর্যের কথা। যে স্বদেশকে খুঁজে নিতে চান তিনি আধুনিকের প্রকরণে, তার একটি ভিত্তিভূমি যেন রয়ে যায় যামিনী রায়ের জীবন ও শিল্পে।

একটিই ছবি দেখি, রঙের রেখার দুর্নিবার এক বিস্তার
মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কয়দিন, অথচ যামিনীদার
প্রত্যহের আসনের এ শুধু একটি নির্মাণ, একটি প্রকাশ,
হাজার হাজার রূপধ্যানের মালার একটি পলক
যেখানে সন্তত গোটা দেশ আর কাল, একখানি আবির্ভাব
স্বয়ম্বশ স্বতন্ত্র স্বাধীন,
অথচ রঙের প্রতি ঢেউ-এ ঢেউ-এ দোলা দেয় পঞ্চাশ বছর, নিত্যকর্মী
সমগ্র শিল্পীর জাগ্রত জীবন,
শুধু কি শিল্পীর, তাঁর নিজের ঘরের, বংশের, দেশের
আধভোলা, ভোলা, চৈতন্যের, রক্তের প্রভাব,
সারা পৃথিবীর ছায়া, রৌদ্রে জলে রেখা রঙে
একটি ছবিতে উজ্জীবন প্রায় প্রত্যাভাস
যেমনটি সাগরসংগমে এসে অলকানন্দার উৎস মেতে ওঠে
জটায় জটিল কপিলের দীর্ঘ ইতিহাস
সামুদ্রিক বন্যা হয়ে ভাগীরথী-মোহানায়।
('তাই তো তোমাতে চাই', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

আমরা জানি, যামিনী রায় সম্পর্কে যেমন শীতলতার অভিযোগ উঠেছে, শুধু বুদ্ধদেবই নন, কিছুটা নিজের মত করে প্রকাশ করেছেন সুধীন্দ্রনাথও তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের শেষাংশে, এমনকি বিষ্ণু দে-ও একবার, তাঁর প্রথম ইংরেজি প্রবন্ধে–সে অভিযোগ ত বিষ্ণু দে সম্পর্কেও। বহুকাল আগে সমর সেন বলেছিলেন, আজকের নবীন সমালোচকও বলেন, ক্রোধক্ষুব্ধ স্বদেশে ও স্বকালে বিষ্ণুদে-র এত 'প্রশান্তি' কেন? বিষ্ণু দে-র মনোযোগী পাঠক জানেন, এ অভিযোগ কতদূর ভুল, কীভাবে তিনি বলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে "শান্তি নেই জীবনের এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে", কীভাবে ছড়িয়ে আছে সময়েরই প্রহার তাঁর কবিতার ব্যাপ্তিতে। সেই বিষ্ণু দে-ই এই উপার্জিত "প্রশান্তি"-র নাম দেন "চির-অস্থির উদাত্ত এক শান্তি"। "শীতলতা"-র ওই অভিযোগেরই তিনি যেন উত্তর দেন! "কোনো দেশে কোনো শিল্পীর মধ্যে....আত্মসচেতনতা প্রকাশ পায় বিষয়ের আপাতবোধ্য মাহাত্ম্যে, যদিচ সেখানেও দেশে-দেশে শিল্পীতে-শিল্পীতে তারতম্য বিস্তর। তাই কারো কাজে কখনো-বা দেখা যায় তথাকথিত বিষয়ের বাস্তব বা প্রত্যক্ষ রূপদানের তাগিদ, কারো কাজে বাস্তব বিষয় হয়ে ওঠে কল্পনার বা রূপের পরোক্ষ চাপে বহুভংগ। কারো কাজে নির্মম মননের অস্থিরতা হয়ে ওঠে প্রধান, কারো-বা কাজে চাক্ষুষ রূপের শান্ত স্থির স্পষ্টতাই মূল উদ্দেশ্য। যামিনী রায়ের বিচিত্র শিল্পপ্রবাদ যেমন অন্বেষায় অস্থির অশান্ত, তেমনি তাঁর চিত্রের লক্ষ্য হচ্ছে শান্ত স্থির রূপ অর্জন।"

এই উপলব্ধিই বিষ্ণু দে-র কাছে যামিনী রায় আর শুধু বিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চার বিষয় নয় কিংবা ব্যক্তিগত বন্ধুই নন শুধু, বিষ্ণু দে-র কাব্যচর্চা এবং তার পেছনের নন্দনবোধ পুষ্ট হয় এই অভিজ্ঞতায় ও দৃষ্টান্তে। শিল্পী যামিনী রায় এবং কবি বিষ্ণু দে-র সংযোগ তাই হয়ে উঠতে পারে সৃজনশীল বন্ধুত্বের অসামান্য দৃষ্টান্ত।

যামিনী রায়ের পক্ষ থেকে ব্যাপারটা কী তাও ত জানা দরকার। যামিনী রায় তাঁর আধুনিক লেখক বন্ধুদের লেখা আদৌ পড়তেন কিনা কিংবা পড়ে তার কী মনে হত তা হয়ত জানার উপায় নেই। নিশ্চয়ই আধুনিক সাহিত্যের পড়ুয়া বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। বন্ধুদের বইয়ের যে মলাট এঁকে দিতেন, তা অবশ্যই বন্ধুকৃত্য। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো হদিশ না খোঁজাই ভাল। কিন্তু ১৯৪৬-এ বিষ্ণু দে-র কোনো বই পড়ে তিনি যে চিঠিতে লেখেন, "বইখানি পড়ে খুব ভাল লেগেছিল, তখুনি জানাতে ইচ্ছে হয়েছিল ডাকবিভ্রাটে হয়ে উঠে নাই। আপনার ভাষার যে একটা বিশিষ্ট রূপ, গতানুগতিক থেকে পৃথক হবার উৎকট চেষ্টাও নাই অথচ পৃথক এবং সংযত, খুবই ভাল লাগল"–তখন তাকে কথার কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। ঠিক এরকমই আমরা সবিস্ময়ে পড়ি তাঁর আরেকটি চিঠি, যেখানে মলাট আঁকতে গিয়ে তিনি জানতে চাইছেন বইটির বিষয়টা ঠিক কী। যতখানি ঔদাসীন্য বা অজ্ঞতা আমরা কল্পনা করি তা বোধহয় সত্য নয়।

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যৌথ আন্দোলনের কথা যাঁরা বলেন বৈদেশিক দৃষ্টান্তে, তাঁরাও জানেন কি ১৯৪২-এর ফ্যাশিস্ট-বিরোধী শিল্পী সাহিত্যিকদের আন্দোলনে যামিনী রায় সামান্য হলেও একভাবে যুক্ত হয়েছিলেন? তিনি ছিলেন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী শিল্পী ও লেখক সংঘের সহ-সভাপতি (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি। যামিনী রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ সহ-সভাপতি)। সংঘের উদ্যোগে, সুকান্ত-র চিকিৎসার জন্য টাকা তোলার বিশেষ তাগিদে, একটি নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, ১৯৪৫-এ। ইয়েটস-এর কাব্যনাট্য। 'পুনরুজ্জীবন' নামে তার অনুবাদ করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। অভিনয় করেছিলেন লেখকশিল্পী নিজেরাই। নির্দেশক বিষ্ণু দে এবং শিল্প-নির্দেশক ছিলেন যামিনী রায়। নাটকের জন্য দরকার ছিল যিশু-র আবির্ভাবের। যামিনী রায় যিশুর পোশাকের ব্যাপারে পরামর্শ ত দিলেনই, মুখোশ এঁকে দিলেন–"ছাই রঙের জমিতে গাঢ় কালো আর সিঁদুরের রেখা"। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'বহুরূপী' পত্রিকায় ওই অভিনয় নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা থেকেই জানতে পারি এসব কথা। ১৩৫০-এ মন্বন্তর প্রতিরোধের আন্দোলনেও তাঁকে নিজের মত করে অংশ নিতে দেখি। সে-সময়ে এক-একটি কবিতা রঙিন মোটা তুলট কাগজে ছাপিয়ে মোট পাঁচটি ফোল্ডার বের করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। ওঁর 'অন্নদাতা' ফোল্ডার-কবিতার জন্য এঁকে দেন যামিনী রায়। সেখানে বিজ্ঞপ্তি ছিল "অন্নার্থীর সাহায্যকল্পে এই কবিতা বিক্রি করা হবে।"

এসব কর্মোদ্যোগ নিশ্চয়ই বন্ধুদের উৎসাহ এবং তাগিদেই। বিশেষ করে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী সক্রিয়তায় বিষ্ণু দে-র ভূমিকা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু, যামিনী রায়কে যাঁরা জানতেন, তাঁরাই বলবেন, আপত্তি থাকলে, প্রাণের কোনো একটা স্তর থেকে সায় না পেলে, তাঁকে এ ধরনের কাজে প্রবৃত্ত করাটা কতদূর দুঃসাধ্য ছিল। এ থেকে অবশ্য এটাও বলবার নয় যে, যামিনী রায় কোনো-অর্থেই বন্ধুদের রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বিশ্বাসের শরিক ছিলেন। তিনি যে এক-অর্থে আদ্যন্ত অ-রাজনৈতিক মানুষ তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু, বিষ্ণু দে যেটা দেখিয়েছেন সমাজ জীবন রাষ্ট্র সম্পর্কেও ছিল তাঁর স্বকীয় ধ্যানধারণা। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গির ধরনে তাকে উদ্ভট এবং অজ্ঞতাপ্রসূত মনে হতে পারে। কিন্তু বিষ্ণু দে বা এমন কি সুধীন্দ্রনাথ তা মনে করেন নি, তাঁরা তার নিহিতার্থের গভীরতাকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন। বিষ্ণু দে অন্তত তাঁর নিজের অনুসৃত সংস্কৃতি বা রাজনীতির সূত্রে সেসব মতামতকে খুবই মূল্যবান, বিবেচনাযোগ্য এবং জরুরী মনে করতেন।

গোলমালটা এখানেই যে, আমরা লেখকের যে আত্মসচেতনতা, তারই সংজ্ঞা বা ধারণা দিয়ে শিল্পের অন্যক্ষেত্রের আত্মসচেতনতাকে বুঝতে চাই। লেখা বা বলা যাঁর মাধ্যম নয়, নিজের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মসচেতনতা, যতই গভীর ও তীব্র হোক, তা লেখা বা চলার মধ্য দিয়ে যথোচিত প্রকাশ নাও পেতে পারে। সেটা প্রকাশ পায় তাঁর নিজেরই শিল্প মাধ্যমে। কিংবা তাঁর আপাত বিশৃঙ্খল কথাবার্তা বা লেখারই ভেতরে লুকিয়ে আছে যে শৃঙ্খলা তার অনুধাবনে। সেদিক থেকে যামিনী রায়ের আত্মসচেতন আধুনিকতা শিল্পে ত বটেই, এমনকি তাঁর সাহিত্যিক-বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে বা চিঠিপত্রেও খুঁজে পাওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে অন্তত সেই আধুনিকতার খোঁজ পেয়েছিলেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গণসঙ্গীত

দিলীপ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গতথা ভারতবর্ষের গণসংগীতের আকাশে এক নক্ষত্রপাত ঘটল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সেই নক্ষত্র। তাঁর পঞ্চাশ বছরের সংগীতসাধনার ছেদ পড়ল। যিনি চলে যান তাঁর স্থান পূরণ হয়না, কিন্তু ইতিহাস হয়ে থাকেন তাঁর কীর্তির বলে, কীর্তির মধ্যে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসও ইতিহাস হয়ে গেলেন। তাঁর একসময়ের সাথী ও সহযোদ্ধা গণসংগীতকার ও সুরকার শ্রী দিলীপ সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সংঘের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যথাযোগ্য স্মৃতিচারণা তিনি করেছেন এই নিবন্ধে। সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ

"যারা হাল চষে, দাঁড় টানে, তাঁত বোনে, তাদের কণ্ঠে গান কিন্তু পেটে ক্ষুধার টান। গ্রামের জমিদার, জোতদার, ধনী কৃষক, মহাজন এবং নানা রকম ফড়েরা কি ভাবে তাদের শ্রম শোষণ করে নিচ্ছে—সে অনুসন্ধান ও অনুভূতিটা একাত্ম হওয়ার প্রাথমিক করণীয়। শোষকের বিরুদ্ধে এদের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন সংগ্রামের ইতিহাসটা জানতেই হবে। এই দৃষ্টিকোণের টেলিস্কোপটা হল মার্কসবাদ লেনিনবাদ। এটাই একমাত্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ যার আলোতে আমরা সব দেখতে পাবো। শোষক-শোষিতের এই সংঘাতটা প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত লোকগীতির জীবনদর্শনে, এমন-কি, তার সুরের ক্ষেত্রেও।

কর্মনিঃসৃত লোকসংগীতের দর্শন হল জীবনবাদী—কিন্তু শোষণকারীর দর্শন হল জীবনবিমুখী। শোষণকারী সমাজের পুরোহিতরা প্রচার করে শ্মশানের বৈরাগ্য।" (Ethnic Songs of Estern India—পৃঃ-১৪)

১৬ জানুয়ারী ১৯৭৭ রবীন্দ্রসদনে ON STAGE' এর পরিচালনায় একটি লোকসংগীতের অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস তার নিবন্ধে এই কথাগুলি প্রকাশ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই হেমাঙ্গদা লোকসুর অবলম্বনে অসংখ্য গণসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন—যার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান ও তার রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। হেমাঙ্গদার রচিত, সুরারোপিত, অনুবাদকৃত বহুগানের অনেকগুলিই সর্বকালীন আবেদনে সমৃদ্ধ যা গণসংগীতের ভান্ডারে অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে। রচনার দিক থেকে সহজবোধ্যতা যা শহর ও গ্রামবাংলার মানুষকে সমভাবেই আকৃষ্ট ও উদ্দীপ্ত করে, এটাই হেমাঙ্গদার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সুরের ক্ষেত্রে তিনি লোক-আঙ্গিকের নানান সুর সংযোজন করেছেন। আসাম, মহারাষ্ট্র, বাংলা লোক সুর অবলম্বন করেই তার যতো সৃষ্টি—যার ফলে তার রচনায় নানা সুরের বৈচিত্র। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তথা ফ্যাসীবিরোধী, শ্রমিক-কৃষক মেহনতীমানুষের সংগ্রাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার তীব্র শ্লেষাত্মক রচনাগুলিই তাকে গণসংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হিসাবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এখানে তারই কিছু নিদর্শন উপস্থিত করছি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রাক্ স্বাধীনতা কালে তার রচিত ও দেবব্রত বিশ্বাস সুরারোপিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করেছিল যে গানটি –

> "জালিনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ,
> চল চল বীর পরো পরো বীর সৈনিকের বেশ,
> স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়নি কো আজও শেষ।।
> হত্যাকারীর আজও হয়নি বিচার,
> হয়নি তো শোধ দু'শতকের রক্তের যত ধার,
> শোষণের কারাগার ঘিরে চারিধার,
> ভ্রাতবিরোধ ডুবেছে স্বদেশ।" ইত্যাদি.....

এই গণসংগীতে হেমাঙ্গদা একদিকে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে উদ্দীপিত করছেন অপরদিকে বৃটিশের Devide and rule' এই ঘৃণ্য চক্রান্তের ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিপদটিকে উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৭ সালে ১৫ আগষ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া পুঁজিপতি জমিদার গোষ্ঠীর গোপন আঁতাতের ফলশ্রুতি হিসাবে যে দ্বিখন্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ঘটলো যার একপিঠে হিন্দুস্থান ও অপর পিঠে পাকিস্তান, তা হেমাঙ্গদা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সংগীতে জেহাদ ঘোষণা করলেন—

> "আজাদী হয়নি আজও তোর, নব বন্ধন শৃঙ্খল ডোর,
> দুঃখ-রাত্রি হয়নি ভোর, আগে কদম্ কদম্ চল জোর।।
> শত শহীদের আত্মদান, একি তারই প্রতিদান,
> দেশদ্রোহীর এ বিধান চূর্ণ কর, কর অবসান।।
> সাম্রাজ্য-শাহীর পাতা ফাঁদে, খুনি বণিকের এ বনিয়াদ,
> ভাঙরে ভাঙ শোষণের বাঁধ শোন মহাচীনের সংবাদ।।
> ওরে ও কিষাণ মজদুর, আর মঞ্জিল নয় নয় দূর,
> ওরে তবুও তো পথ বন্ধুর, আগে কদম্ কদম্ চল জোর।।

শত শত শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এলো তা বুর্জোয়া পুঁজিপতি জমিদার শাসক গোষ্ঠীর শাসন শোষণে কখনই জনহিতকর হতে পারে না এবং জনগণের দুর্দশা এক চরম সীমায় পৌছুবে এই আশঙ্কা নিয়েই হেমাঙ্গদা যে ব্যাঙ্গাত্মক গানটি লেখেন, সেই 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গল কাব্য' তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে আমি মনে করি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই গানটি রচনা করেই সকলের কাছে প্রখ্যাত গণশিল্পী হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই মঙ্গলকাব্যটি যখন যেখানে হয়েছে মানুষ প্রচন্ড হেসেছে, ভেবেছে, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে। মনসা মঙ্গল কাব্যের সুরকে যথাযথ রেখেইএই ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্যকে অতি সহজভাবে প্রকাশ করা হেমাঙ্গদার মতো প্রতিভাধরের পক্ষেই সম্ভব। বিশাল এই গানটির সবটুকু দেওয়া এখানে আদৌ সম্ভব নয় তাই কিছু কিছু অংশের উল্লেখ করছি সামান্যতম আভাস দিতে—

> "মাউন্টব্যাটন সাহেব ও।
> তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গ্যালা ও,
> তুমি সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও, কই চলিলায়।।
> সর্দারি কান্দে, পন্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়
> (কিরে হায় হায়রে)
> আর মাথাই এ যে মাথা কুটে, বলদায় বুক থাপ্‌রায়,
> তোমার শ্যামা-চেট্টি ভক্তবৃন্দেও, তারা ধূলায় গড়াগড়ি যায়।।
> কান্দে রাজা, মহারাজা; তোমার পুষ্যবাছা,
> আর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্দে ও কালো বাজারের প্যাটলা হুতুম প্যাচা।
> তোমার নয়াদিল্লি ডুবুডুবু ও, বুঝি ভঙ্গ বঙ্গ ভেসে যায়।।
> যেইন তোমার পরবর্তী, আইলা গোপাল রাজচক্রবর্তী,
> আইলা গান্ধী-ভস্ম তিলক মাথায় ধুতি চাদর গায়,
> (মরি হায় হায়রে)।
> ক্লাইভ-কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায়
> (মরি হায় হায়রে)
> বামুনের খুশী মন জলভরা নয়ন, তোমার লেডির গাউন
> কান্দিয়া ভিজায়।।"

"নয়া দিল্লিতে ঘোর কলিতে আইলা কল্কি অবতার,
কি বাহার! পতিত ভারত করিতে উদ্ধার।
আর বড় বড় দেশ নেতা দিলা পায়ে ধর্ণা,
তপস্যায় লভিলেন বর স্বরাজ অন্নপূর্ণা
হবে ধনধান্যে পূর্ণা।

শুন শুন শুন সবে, শুন দিয়া মন, (ভালো বেশ বেশ বেশ)
স্বরাজের মাহাত্ম আমি করিব বর্ণন। (")
পনের আগস্ট দিনে সাতচল্লিশ সন, (")
দশভূজা স্বরাজ দেবী কইলা আগমন। (")
সাগর পারের বূড়া সিংহী রহিলা বাহন, (")
দশ হাতে দেখি নতুন দশ প্রহরণ। (")
প্রথম হাতেতে ধরেন খড়্গ প্রহরণ, (")
অখন্ড দেশের মুন্ড করিলেন ছেদন। (")
দ্বিতীয় হাতে বরাভয় অহিংস ব্যাটন, (")
সাধুরে দমন করেন চোরেরে পালন। (")
তৃতীয় হাতে করেন দেবী কন্ট্রোল নিধন, (")
একদৌড়ে চল্লিশটাকা ওঠে চাউলের মণ। (")
চতুর্থ হাতেতে করেন বসণ হরণ, (")
ল্যাংটা-শিবের ধর্ম দেশে করেন প্রচলন। (")
পঞ্চম হাতে বশীকরণ মারণ উচাটন, (")
ক্ষুধার ভূত কাঁদুনে গ্যাসে করেন বিতারণ। (   )
ষষ্ঠ হাতে বন্ধ করেন জাতীয় করণ, (   )
জাতিভেদ দূর আসে বিজাতী মূলধন। (")
সপ্তম হাতে গড়েন দেবী দালাল ইউনিয়ন, (")
কৃষক সভা, মজুর সংঘে পাঠান বিভীষণ। (   )
অষ্টম হাতে ভক্তজনে বর বিতরণ, (   )
মন্ত্রীগিরি, কন্ট্রাক্টরী করিলেন বন্টন। (")
নবম হাতে গান্ধী-ভস্ম ঔষধ ধারণ, (   )
রাষ্ট্রদ্রোহী সর্বরোগে বিশল্যকরণ। (")
দশম হাতে নিরাপত্তার নাগপাশ বন্ধন, (")
লালজুজু নিশম্ভূরে করিতে নিধন।" (   )

"এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন।
জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন।
টাটা বিড়লা তেরে নাম, জয়বল্লভ গোপাল রাজারাম,
মজুর কিসান হ্যায় নিমক্‌হারাম, মুঝকো মুনাফা
দে ভগবান।।

যে বাঁশীতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাঁশরী,
সেই বাঁশ যে ডান্ডা হইয়া মাথায় মারলো বারি।
(আহা মরি মরি মরি)
মাটি চাইয়া লাঠি পাইলাম, দিয়া বুকের খুন,
হাসির বদলে ফাঁসী পাইলাম দইয়ের বদলে চূণ।
(আহা মরি মরি মরি)
চাকরী চাইয়া ছাঁটাই পাইলাম, কাপড় চাইয়া দড়ি,
এখন কলস যে ভাই কিনি হাতে নাইতো এমন কড়ি।
(আহা মরি মরি মরি)
হিন্দুস্থানে শ্বশুর বাড়ী, পাকিস্তানে ঘর,
মধ্যিখানে ভূতের ময়দান, বউয়ে হইল পর।
(আহা মরি মরি মরি)
রামরাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ,
ল্যাজের আগুণ দিয়া সোনার লঙ্কা করে ধ্বংস।
(আহা মরি মরি মরি)
ঠগের বড়ি নিমন্ত্রণ বুঝিলায় অবেলায়,
রাজভোগ খাওয়াইবো কইয়া খাওয়াইল কাঁচকলা।
(আহা মরি মরি মরি)
মাথায় ভাঙলো কাঁঠাল ভাইরে, মুখে লাগলো আঠা,
স্বরাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বলির পাঁঠা।
(আহা মরি মরি মরি)"

চল্লিশ দশকে লেখা এই অনন্যসাধারণ গানটি বর্তমান প্রেক্ষাপটেও কংগ্রেসী শাসকদের শাসন শোষণের চরিত্ররূপকে যে ভাবে উদ্ঘাটিত করে তাতে হেমাঙ্গদার চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিপক্কতার কথাই প্রমাণ করে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন যে গানটি তা আজও সমভাবে মানুষের মনকে আপ্লুত করে এবং শাসক বর্গের প্রতি ঘৃণার পাহাড় সৃষ্টি করে। তাল বিহীন লোক-সুরে সমৃদ্ধ এই গানটি–

"আমরাতো ভুলি নাই শহীদ
এ কথা ভুলবো না,
তোমার কইলজার খুনে রাংগাইল কে
আন্ধার জেলখানা।" ইত্যাদি.....

যতদূর মনে পড়ে ভারত বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রথম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাস একটি গণসংগীত রচনা করেছিলেন তা উপলক্ষ্য ও সময়কাল ছাড়িয়ে আজও সমভাবে গীত হয়ে থাকে এবং যা সর্বকালীন ও সার্বজনীন আবেদনে পুষ্ট। গানটি প্রথম স্তবকটি এখানে উল্লেখ করলাম–

"বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা বাঁচবোরে বাঁচবো,
ভাঙ্গা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়বো।।
বিভেদ গাঙ্গের বাঁধবো দুইকূল,
বাঁধবো আবার মিলনের পুল,
যত বাস্তুহারা, সর্বহারার সুখের গৃহ গড়বো।।" ইত্যাদি.....

–বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের চক্রান্তে বাস্তুচ্যুত উদ্বাস্তুদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিবর্তে সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হেমাঙ্গদা এই গানটিতে করেছেন। সমস্ত বিভেদ পন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন।

পি.এল.টি প্রযোজিত ও উৎপলদত্ত পরিচালিত 'কল্লোল' নাটকে সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষব্যাপী সর্বস্তরে যে উত্তাল বিদ্রোহের ঢেউ উঠেছিল, নৌ বিদ্রোহ সাম্রাজ্যবাদের ভিৎকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্রের লোকসুর পওয়াড়া অবলম্বনে যে গানটি লিখেছিলেন তা প্রতিবছর 'নৌবিদ্রোহ দিবস' বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে। গানটির কিছু অংশ–

"বাজে ক্ষুব্ধ ঈশাণী ঝড়ে রুদ্র বিষাণ
ইনক্লাবী আহ্বান–
নিথর জলধিজলে জাগে উতরোল
বিষ-মন্থনে ওঠে জীবন-হিন্দোল,
ক্রূর বন্ধন ভেঙ্গে ভেঙ্গে তরঙ্গ রঙ্গে ওঠে
সমুদ্র কল্লোল-উঠিল সমুদ্র কল্লোল।।
* * * * * *

সেদিন ছেচল্লিশের শীতের কুয়াশা
ভেদি গোলামীর ঘোর অমানিশা
চূর্ণ করি কংসের কারাগার।
সচকিত সাইরেনে নব অঙ্গীকার
আরব সাগরবাহী অতলান্তজয়ী
বোম্বাই বন্দরে বিদ্রোহী 'খাইবার'
ভিড়িল বিদ্রোহী 'খাইবার'।।

হাঁকে শার্দুল সিংগফুর
বীর শার্দুল সিং গফুর
কে আছ বাহাদুর,
কামান গর্জনে
কামগার ময়দানে
রাজপথে ব্যারিকেডে সশস্ত্র মজদুর
দাঁড়ালো সশস্ত্র মজদুর"।। ইত্যাদি.....

বিভিন্ন রাগরাগিনী, অসমীয়া ও অন্যান্য লোকসুরে সমৃদ্ধ 'শঙ্খচিল' গানটি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অন্যতম জনপ্রিয় সৃষ্টি। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের বীর জনগণের লড়াই ও বিজয়ের অঙ্গীকার অত্যন্ত কাব্যিক ভাষায় তিনি ছন্দবদ্ধ করেছেন। আনবিক বোমায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোসিমার কথাও বলেছেন –

"সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে
হিরোসিমা দ্বীপের আমি শঙ্খচিল।
আমার দু'ডানা ঢেউয়ের দোলা
আমার দু'চোখে নীল শুধু নীল।।
* * * * * *

"হঠাৎ সেদিন শুভ্র শরত সকালে
মায়াবী রোদের রূপালী ঝালর
ছিন্নভিন্ন করে,
কোন বিষাক্ত বাসুকীর ফণা দিগন্ত দিল ঢেকে।

প্রলয়ঙ্কর নিঃশ্বাসে তার ধ্বংস ছড়ালো দিগ্বিদিক,
আনবিক সে দানবিক সে মৃত্যু নৃত্য নেচে,
ধ্বংস নৃত্য নেচে
দারুণ আগুণ দহন জ্বালায় দগ্ধ ভস্মীভূতা
প্রশান্ত দুহিতা।"

"আমার এ অঙ্গীকার, আমার এ অঙ্গীকার
আক্রান্ত প্রশান্তের অশান্ত বিহঙ্গ দুরন্ত দুর্নিবার।
ঝড়ের নিশানা আমার দু'ডানা
চির উড্ডীন অক্লান্ত প্রশান্ত হতে অতলান্ত।
প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, চিরক্ষমাহীন।
আমার শান্তিগানে বিদ্রোহ বান আনে
আফ্রো এশিয়া আমেরিকায়।
আমার ডানায় তোলে আঁধিয়া আকাশতলে
ঝনন ঝনন মরুঝনঝা সাহারায়।
নদনদী প্রান্তরে, অরণ্য অন্তরে, পাহাড় ও গহ্বরে
প্রতিদিন লেপে দিই রক্তের রঙ
আমিই ভিয়েৎমীন, আমিই ভিয়েৎমীন, আমি ভিয়েৎমীন,।"

পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগে (সন তারিখ মনে নেই) রাজ্য শিক্ষক সম্মেলন উপলক্ষে হেমাঙ্গদা একটি গান লিখেছিলেন এবং এই নিবন্ধকারকে সুর করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গানটি সেই সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো এবং বিভিন্ন শিক্ষক সমাবেশে, সম্মেলনে গাওয়া হতো। গানটি পাশ্চাত্য সুরে হলে ভাল হবে এই উপলব্ধি থেকেই আমাকে সুর করতে দেন। গানটির উল্লেখ করছি–

"তোমরা জ্বেলেছো দীপ
তোমরা দিয়েছো আলো,
তোমরা কেন গো আঁধার কুটীরে
ক্ষুধায় শীর্ণ-কালো।।
নালন্দা আর তক্ষশীলায়
অতীত ভারতে দেখেছি তোমায়
উজ্জ্বল মহিমায়।
গুরুর আসন দিয়েছি তোমায়
বিশ্ব বেসেছে ভালো।।

কত মূক মুখে দিয়েছো ভাষা
কলিতে ফুটেছে ফুল,
এই বাংলায় তোমরা গড়েছো
রবীন্দ্র নজরুল।
তোমাদের যারা করে অপমান
ধুলায় লুটাবে তাদের নিশান
সাবধান ওরে সাবধান /
বিদ্যালয়ের ভীরু-বাতি যতো
মিছিলে মশাল হ'লো।।"

হেমাঙ্গ বিশ্বাস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এমন অনেক বিদেশী ভাষার গণসংগীত বাংলায় অনুবাদ করেছেন, এর মধ্যে "জন হেনরী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং যা আজ গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষকে মুগ্ধ করে। মূল ইংরাজী থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে হেমাঙ্গদ কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছেন, যাতে মৌলিক ভাবের কিছু ব্যাঘাত ঘটে তা সত্ত্বেও এর সহজবোধ্যতা ও শৈল্পিক আবেদনে আজ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি অতি প্রচারিত বলে এর কোনও অংশ আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজনবোধ করলাম না।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিশাল সৃষ্টি সমূহের সামান্যতমই এখানে উপস্থিত করলাম। অনেকটাই বাকী রয়ে গেল যা পরবর্তী কোনও এক সময় কর যাবে।

হেমাঙ্গদা আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু গণসঙ্গীতের যে অমূল্য সম্পদ তিনি রেখে গেছেন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের গণশিল্পীদের কণ্ঠে কণ্ঠে তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষকে সকল সংগ্রামে উজ্জীবিত করবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।



ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব, বিস্তৃত পশ্চাৎ ভূমি-সেবিত বন্দর, প্রাকৃতিক প্রাচুর্য ও কারিগরি নৈপুণ্যের আনুকূল্য সত্ত্বেও পরাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ অভিলষিত শিল্প সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে নানা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা ও পক্ষপাতমূলক শিল্পনীতির ফলেই এরাজ্যের শিল্প-প্রসারের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। মাশুল সমীকরণ নীতি বিশেষ করে এ রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় নিয়ে আসে। ভারতবর্ষ মূলত কৃষিনির্ভর হলেও শিল্পের উন্নতি ছাড়া আধুনিক যুগে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সংভৃতি-পত্রের (লেটার অব ইনটেন্ট) অনুমোদন ও আর্থিক সংস্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া বৃহৎ শিল্প স্থাপন অসম্ভব। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গর প্রশাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এ রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের দিকে, বিশেষ করে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে, নজর দিয়েছে। কারণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ছাড়া এরাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু কুটির শিল্পই হোক বা ক্ষুদ্র শিল্পই হোক–তার উদ্যোগের সাফল্য অর্জনে বিভিন্ন সংস্থা ও পরিকাঠামোর সহযোগিতা প্রয়োজন।

রাজ্য সরকারের বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গ, সেক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যের কথা মনে রেখেই, এই বিভাগের প্রবর্তন করেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ শিল্পোন্নয়ন-গবেষণারত এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ্‌গণ এই বিভাগে নিয়মিত নিবন্ধ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা শিল্প গড়ার তথ্যের পরিবেষণে শুধু যে অভিজ্ঞ তাই নয়, পারদর্শীও বটে। সাধারণ পাঠক এবং যেসব যুবক-যুবতী শিল্প গড়তে আগ্রহী তাঁরা সকলেই এই বিভাগটিতে ক্রমপ্রকাশমান নিবন্ধগুলি পাঠে উপকৃত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। –সম্পাদক

শিল্প গড়ার সামগ্রিক চিত্র–প্রথম পর্ব

শ্রীসনত সিংহ, শ্রীপ্রবোধ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রভাস শেঠ

সম্প্রতি রাজ্যের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার একটি নির্দেশক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্ষুদ্র শিল্প গড়তে হলে'। এই পুস্তিকার ভূমিকায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে 'ক্ষুদ্রশিল্প আরো গড়তে হলে নিয়মকানুন জানা ও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারি স্তরে ও উদ্যোগীদের মধ্যে আরো বেশী তৎপরতা ও সচেতনতা প্রয়োজন।' তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে পুস্তিকাটি এ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করবে।

ইতিমধ্যে অনেক শিল্পোদ্যোগী পুস্তিকাটি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের বিভিন্ন অফিস থেকে সংগ্রহ করে উপকৃত হয়েছেন। তবু একথা ঠিক যে অনেকেই এখনো পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। অথচ সেখানে শিল্পসংস্থা গড়ে তোলবার জন্যে যে যে বিষয় অতি সংক্ষেপে বলা আছে তা জানলে সকলেই উপকৃত হবেন।

এই পুস্তিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। অনেক বিষয় এখনো আলোচিত হয়নি। সামগ্রিক চিত্রটা তুলে ধরতে হলে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু সেই বিষয়গুলি আলোচনা করা ঠিক হবে না। সেজন্য কোন কোন বিষয় পুনরাবৃত্তি হলেও শুরু থেকে শেষ অবধি আমরা একসঙ্গে এবার আলোচনা করব। বলা বাহুল্য আলোচ্য পুস্তিকাটিরও সহায়তা গ্রহণ করব। যাতে যাঁরা পুস্তিকাটি পাননি তাঁরাও পুস্তিকাটি পেলে যতটা উপকৃত হতেন ততটা উপকার এই প্রবন্ধের মাধ্যমেই লাভ করতে পারেন। একটা কথা আমরা বারবার জানাতে চাইছি। কথাটি হোল–শিল্প গড়ার পুরোপুরি চিত্রটা মনের মধ্যে গেঁথে না নিতে পারলে অসুবিধা এড়ানো সম্ভব হয় না। যতই জানুন না কেন কে, কোথায় সহায়তা দিচ্ছে, কোথায় গেলে কি পাওয়া যায় না জানা থাকলে আসল কাজ এগোবে না। আর না এগোবার জন্যে যাকে যতই দায়ী করুন না কেন আপনার নিজের লাভ হবে না কিছুই। সেজন্য নিজের পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি প্রভৃতিকে সংগঠিত করা আগে দরকার। ঠিক করা দরকার কোথা থেকে, কিভাবে শুরু করবেন এবং শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে কোথায়, কিভাবে পৌঁছতে চান। আর তার জন্য আপনার নিজের কি কি প্রস্তুতি দরকার। পর্যায়ক্রমে এক একটি লক্ষ্য স্থির করতে পারলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। এ কারণে এক একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনার মাঝে মাঝেই শিল্প গড়ার সমস্ত বিষয় নিয়ে কখন কখন আলোচনা করব।

অনুষঙ্গী (এ্যান্সিলারী) শিল্প কাকে বলে তা জানতে পেরেছেন। এই সংজ্ঞাটা জানা খুব দরকার। এটাও জানা দরকার যে এই সংজ্ঞা মাঝে মাঝে বদলায় বদলান ভারত সরকার। অবশ্য নানান বিচার বিবেচনার পর। অতএব পরিবর্তনের দিকেও নজর রাখা খুবই প্রয়োজন।

এর পরেই আসছে কি? কি মাল বা পণ্য উৎপাদন করবেন তা ঠিক করা। এ সম্বন্ধেও আমরা যা জানিয়েছি সেটা সংক্ষেপে আবার জানাই। নিজের এলেকা বা যে এলাকায় উৎপাদন করতে চান তার সম্বন্ধে জানা; যা উৎপাদন করতে চান সে বিষয়ে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; নিজের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতা; আর কারিগরী কুশলতা যদি নিজেরই থাকে ভালো, না হলে সুদক্ষ কারিগরের সন্ধান নেওয়ার পর সবগুলি মিলিয়ে বিচার করতে হবে। কি হবে আপনার উৎপাদিত পণ্য? এ ভাবে ঠিক হবে কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রকল্প রচনা করতে হবে। অনেকে মনে করেন শুধু সরকারি সাহায্য নিতে হলেই প্রকল্প রচনার প্রয়োজন। তা কিন্তু ঠিক নয়। কারো সাহায্য ছাড়াই যদি কিছু শুরু করতে চান তাহলেও এটা কিন্তু করা দরকার।

একটা সামান্য সহজ উদাহরণেই এটা পরিষ্কার হবে। বাড়িতে একটা সামান্য কোন অনুষ্ঠান হলে বাড়ীর বিচক্ষণ কর্তা কি করেন? প্রথমে ঠিক করেন কবে অনুষ্ঠানটি হবে। আমন্ত্রিত কত জন? তাঁদের মধ্যে কতজন আসতে পারেন? তাঁদের ঠিকমত আপ্যায়নের জন্য কি কি দরকার? ওঠা বসার জন্য কি কি দরকার? খাওয়া দাওয়ার জন্য কি কি দরকার? রাত হলে লোডশেডিং ঠেকাতে কি ব্যবস্থা নিতে হবে? এমনি আরো কত কি। সব তিনি একটা তালিকাভুক্ত করেন। তারপর প্রতিটি বিষয় আলাদা করে তাতে কি কি লাগবে ঠিক করেন যেমন খাওয়ার ব্যাপারে কি কাঁচা আনাজপাতি কিনতে হবে? মাছ মাংস কি পরিমাণ আনতে হবে? তেলমসলা কি চাই? এসব ঠিক করার পর তিনি কি করবেন? অন্য দিকটাও দেখবেন। যেমন—কে রান্না করবে? ভালো ঠাকুর মিলবে কোথায়? সেটা কে জানে? কদিন আগে তাকে টাকা আগাম দেওয়া দরকার ইত্যাদি। এক একটি বিষয় নিয়ে বিচক্ষণ কর্তা এইভাবে তালিকা তৈরী করে এক এক জনকে ভার দেবেন এক একটি বিষয়ের। ফলে দেখা যাবে অনুষ্ঠানের দিনে কোন গোলযোগ হয়নি। কোন আমন্ত্রিত ব্যক্তি অখুশী বা বিরক্ত হননি। কোন কিছু কম পড়েনি বরং সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত থেকেছে। এক কথায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অথচ কর্তা সারাক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন থেকেছেন।

সাধারণ একটা একদিনের অনুষ্ঠানের জন্য বিচক্ষণ কর্তা যে কাজটি করেন সেটাই প্রায় প্রকল্প রচনা বলতে পারেন। আপনাকে এই বিচক্ষণ কর্তার ভূমিকা নিতে হবে প্রকল্প রচনাকালে। এই পদ্ধতিতেই প্রকল্প রচনার আগে কিন্তু আপনাকে কয়েকটি বিষয় জেনে নিতে হবে। সেগুলি কি?

১) যে পণ্য উৎপাদিত হবে তার চাহিদা ও বাজার সম্পর্কে বিশদ খোঁজ খবর।

২) মোট কি পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন।

৩) যদি বিশেষ ধরনের কারিগরী কুশলতা প্রয়োজন হয় তাহলে তা পাওয়া যাবে কিভাবে তার খবরাখবর।

৪) কোথায় মিলবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সে বিষয়ে খবরাখবর। যদি বিদেশী হয় তাহলে সেই যন্ত্রপাতি পেতে কতদিন লাগবে।

৫) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কোথায় পাওয়া যাবে। এখানে আমদানীকৃত কাঁচামাল প্রয়োজন হলে কিভাবে পাওয়া যাবে।

৬) দক্ষ কারিগর সম্পর্কিত খবরাখবর। শুধু উৎপাদনের কাজের জন্যই নয়, অনেক সময় শুরুতে যন্ত্রপাতি ঠিকমত বসানো ও তৎসংক্রান্ত কাজেও দক্ষ কারিগর দরকার হয়।

৭) সরকার, ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন ঋণ প্রদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ নেবার প্রয়োজন হবে কিনা এবং হলে তার সম্ভাব্য পরিমাণ।

৮) প্রকল্পটি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের অনুমোদিত না হলে ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। সে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ নিয়ে ঋণ প্রদানকারী সংস্থার বয়ান মতো জমা দেওয়ার পদ্ধতি।

৯) প্রকল্পটি রূপায়িত করার এলাকা ঠিক করা।
যদি অনগ্রসর এলাকায় হয় তার জন্য সুযোগসুবিধা পাওয়া যায় অনেক, যদি শিল্পতালুক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে করতে চান সেক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য মেলে, সমস্ত তথ্য জানা থাকা ভালো।

১০) প্রয়োজনে প্রকল্প রচনার কাজে সরকার অনুমোদিত কোন পরামর্শ প্রদানকারী সংস্থা বা 'কনসালটেন্সি অরগ্যানাইজেশন্'কে দিয়ে প্রকল্পটি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনষ্টিউট (এস.আই.এস.আই) যে সহায়তা করে থাকেন সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে।

এখানে একটা বিষয় বলে রাখতে চাই। যদি কোন কনসালটেন্সি বা পরামর্শ প্রদানকারী সংস্থার সাহায্য প্রকল্প রচনা করা হয় তবে একটা দুর্বলতা থেকে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তাঁরা আপনার হয়ে নানান খবরাখবর নিয়ে প্রকল্প রচনা করে থাকেন। ফলে উপরে আলোচিত অনেক বিষয়ে আপনি অন্ধকারে থেকে যাবেন। এতে আপনার বিশেষভাবে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কারণ এই সমস্ত বিষয়ই আপনার পরবর্তীকালে জানা বিশেষ দরকার হবে। কিন্তু তখন জেনে নিতে গেলে কোন কোন কাজ পিছিয়ে পড়বে। এর জন্য তাহলে কি করবেন? প্রকল্প রচনার কাজে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাহায্য নিলেও প্রকল্প রচনাকালে যা যা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে থাকুন। মনে রাখবেন, নিজে একটা খবর নিতে গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক বেশি খবর জানা হয়ে যায়। যেমন—অন্য কোন লোককে অভিধান দেখে কোন শব্দের প্রতিশব্দ জানাতে বললে শুধু প্রতিশব্দই জানা হবে কিন্তু নিজে দেখে জানতে গেলে অন্য অনেক শব্দ ও তাদের প্রতিশব্দও জানা যেতে পারে। অতএব প্রকল্প রচনাকালে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে নিজে বসে থাকা ঠিক হবে না।

প্রকল্প রূপায়ণ প্রস্তুতি

প্রকল্প রচনার কাজ শেষ হলে তার রূপায়ণের কথা ভাবতে হবে। এ বিষয় সর্বপ্রথম কাজ হলো প্রকল্পটি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া। একটা কথা এখানে জেনে রাখা ভালো। প্রকল্পটি অনুমোদন করাতে সময় লাগে। অতএব আগে থেকে সেজন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। কারণটা একটু খুলে বলি।

ধরুন, আপনি খুব ভালো একটি প্রকল্প রচনা করেছেন এবং আপনার সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। অতএব আপনার সংগত কারণেই মনে হতে পারে—'এত খেটেখুটে একটা সুন্দর প্রকল্প তৈরী করলুম আর কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকারের দরজায় ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ গেল'। আপনার এই ভাবনার সংগে প্রকৃত চিত্রটা একটু আলাদা।

আমরা যখন কিছু প্রত্যাশা করি তখন সব কাজই চাই অবিলম্বে হয়ে যাক্। কিন্তু যাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা তাঁর দিকটাও তো দেখা বিশেষ দরকার। আপনি অতি যত্ন সহকারে যে প্রকল্প রচনা করেছেন তার সব কিছুই হয়ত আপনি বা আপনার হয়ে যিনি করেছেন তিনি জানেন। সেজন্য যিনি প্রথম আপনার হাত থেকে প্রকল্পটি নিলেন, তিনি কিছু না দেখে তো সেটা সম্বন্ধে কিছু করতে পারেন না। তাছাড়া আরো একটা দিক রয়েছে যেটা আপনাদের খাতিরেই সরকারি বিভাগে করতে হয়। সেটা হল প্রতিটি বিষয় বিভিন্ন খাতায় 'রেকর্ড' করা। যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে জানা সম্ভব হয়। এতে কিছু সময় তো লাগবে।

এইবার আপনার প্রকল্প অনুমোদনের জন্য বেশ কিছু কাজ করতে হবে।

প্রথমে ভালোভাবে দেখতে হবে আপনি আপনার প্রকল্পে কি কি তথ্য দিয়েছেন। সেই সব তথ্য সম্পর্কে আগে থেকেই অফিসে কোন 'রেকর্ড' থাকলে সেটা দেখতে হবে। কোন তথ্য নতুন হলে সেটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা দরকার। এছাড়া কোন কোন বিষয় প্রায়শ বদলে যায়। সেখানে আপনার পরিবেশিত তথ্যাদি সেই সম্পর্কে বর্তমান তথ্যাদির সংগে মিলছে কিনা দেখা প্রয়োজন হয়। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এর জন্যও কিছু সময় প্রয়োজন।

এরপর দেখতে হবে যে আপনি যে তথ্যাদি সহকারে পুরো 'প্রকল্প'টি তৈরী করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি রূপায়ণের পক্ষে কতখানি সহায়ক। এটা বিশেষ যত্ন সহকারে না দেখা হলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষতি শুধু আপনার নয় সরকারেরও।

সব শেষে দেখতে হবে আপনার 'প্রকল্পে'র নমনীয়তা কতখানি। অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম বাজারে ওঠা নামার ধকল কতখানি আপনার 'প্রকল্প' সামলাতে পারবে। কারণ 'প্রকল্প' রচনা ও রূপায়ণের মধ্যে যে সময় লাগে তার মধ্যে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দাম কিছু কমবেশী হতেই পারে।

এসব দেখার মূল কারণ হল প্রকল্প রূপায়ণের পথের বাধা যথাসম্ভব অপসারণ করা। এটা ঠিকমত হলে আপনি প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে কম বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হবেন বলে আশা করা যায়। তবে শত যত্ন নিলেও অবাঞ্ছিত ও অভাবিত অসুবিধা হতে পারে বলে ধরে নেওয়া উচিত।

এতো গেল যেখানে প্রকল্প জমা দিয়েছেন সেই অফিসের দিকটা। এবার অন্য দিকের কথা বলি। মনে করুন আপনার পরিবেশিত কোন তথ্য নিয়ে কোন সংশয় দেখা দিল। তখন কি করা হবে? আপনাকে জানাতে হবে সে সম্পর্কে। আপনি চিঠি পড়ে যদি বিষয়টি বুঝে নিয়ে তৈরী হয়ে আসেন তাহলে ভালোই নাহলে আপনাকে 'প্রকল্প' সম্পর্কে কি কি অসুবিধার কথা মনে হয়েছে সেটা জানাতে হবে। যদি আপনি নিজে সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হন তাহলে অসুবিধা কম হবে। নিজেই বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়ে দিতে পারবেন। এজন্যে আগেই বলেছি 'প্রকল্প' রচনা যাকে দিয়েই করান না কেন সবটা নিজে বুঝে রাখতে চেষ্টা করুন। যদি নিজে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়ে সংশয় মোচন করতে না পারেন, তাহলে যিনি প্রকল্প রচনা করেছেন তাঁর দ্বারস্থ হতে হবে। অতএব এতে কতো সময় লাগতে পারে বুঝতেই পারছেন। এজন্যেই বলেছি 'প্রকল্প' অনুমোদনে সময় লাগে। তাই এ ব্যাপারে সময় হাতে নিয়ে নামতে হয়।

এ ব্যাপারগুলো আপনার সামনে তুলে ধরা কিন্তু আপনাকে নিরুৎসাহ করা নয়। এর উদ্দেশ্যে আলাদা। সব কাজেই কতটা সময় কিসে লাগতে পারে তার হিসেব করতে হয়। এসব জানা থাকলে সেই হিসেবে আপনার ভুল হবে না।

আর একটি ব্যাপার সর্বদা মনে রাখা দরকার। সব কাগজপত্র যা যেখানে জমা দেবেন তার কয়েকটি 'কপি' সর্বদা হাতের কাছে রাখুন। কোন কারণে কোথাও প্রয়োজন হলে সামান্য একটা 'কপি'র অভাবে যেন কাজে অকারণ বিলম্ব না ঘটে।

এই 'প্রকল্প' অনুমোদনের জন্যে পেশ করার পর যে সময় অনুমোদন করতে লেগে যাবে তার ফাঁকে কি কি কাজ করে নিতে পারেন ভেবে রাখুন।

'প্রকল্প' অনুমোদন পেলে সেটা রূপায়ণ করতে কি দরকার সবার আগে? সবার আগে দরকার একটি সংস্থা তৈরী করা যা এই 'প্রকল্প' রূপায়ণের কাজে লাগবে। কিন্তু সংস্থা তৈরী করতেও সময় লাগে। সেখানেও অনেক বিষয় ভাববার রয়েছে। যেমন, একা করবেন না কয়েকজন অংশীদার আছেন, কিভাবে সংস্থা গঠন করবেন ইত্যাদি।

সংস্থা তৈরী করার সময় প্রথমে দেখতে হবে সংস্থাটি আপনার একক মালিকানায় বা 'প্রোপাইটরি' হবে কিনা। তা যদি না হয় তাহলে কয়েকজনের যৌথ মালিকানায় হবে কিনা। যদি সেটা হয় তাহলে অংশীদারী স্বত্ব বা 'পার্টনারশীপ' হিসাবে কিভাবে সংস্থাটি গড়বেন সেটা দেখতে হবে। এছাড়া 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী' হিসাবেও আপনার সংস্থা গড়ে তুলতে পারেন। যে কোনোভাবেই করা হোকনা কেন সংস্থাটির গঠন কতকগুলি নিয়ম মেনে করতে হয়। সেজন্য সরকারের বিভিন্ন অফিসও রয়েছে। সেসব জায়গা গিয়ে সমস্ত খবরাখবর নিয়ে তবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে সংস্থাটি গঠন করলে ভবিষ্যতে সুবিধা হতে পারে।

সংস্থা গঠন সম্পূর্ণ হলে সংস্থাটিকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারে নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সেখানে প্রথমে অস্থায়ী বা প্রোভিশনাল রেজিস্ট্রেশন করা হয়। পরে কয়েকটি শর্ত পূরণ করা হলে স্থায়ী বা পারমানেন্ট রেজিস্ট্রেশন করা হয়। একক মালিকানা বা প্রোপাইটরশিপ্ সংস্থার অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন পেতে হলে সংস্থাটি নিয়মমাফিক গঠনের আগেও আবেদন করা যায়। যদিও আইন মোতাবেক সংস্থা গঠন করে তবে সব কিছু করা ভাল।

অংশীদারী স্বত্বের বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে আইন মোতাবেক সংস্থা গঠন না করে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারে নিবন্ধীকরণ করা যায় না। অতএব সংস্থা গঠন করার কাজ 'প্রকল্প' অনুমোদনের কাজের সংগে সংগেই করে যেতে হবে।

সংস্থা গঠনের পর ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে প্রোভিশনাল রেজিস্ট্রেশন পেলে তবে প্রয়োজনবোধে বিদেশী কাঁচামাল ও বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুজ্ঞাপত্র প্রভৃতির জন্য খোঁজ খবর নিতে হবে। এখানেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের একটি নির্দিষ্ট অনুবিভাগে আপনাকে যোগাযোগ করে নিয়মাবলী জেনে নিতে হবে। এছাড়া রয়েছে জমির ব্যাপার। যদি খুব ছোট কারখানা হয়, একটা ঘর ভাড়া নিয়ে করেন তাহলে হয়ত এ বিষয়ে কম ভাবলে চলবে, কিন্তু একটু বড় কারখানা হলে এ বিষয়েও যথেষ্ট ভাববার আছে।

ছোট কারখানা হলে এবং একটা ঘর কোন ঘন বসতি এলাকায় নিলেও পরবর্তীকালে অসুবিধা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ছোট কারখানার জন্যে বেশি না ভাবলেও এটুকু ভাবতে অনুরোধ করি। কারখানা যতটা সম্ভব কারখানার জন্য নির্দিষ্ট এলাকাতে করাই সবচেয়ে ভালো। তাতে পরবর্তীকালের ঝামেলা অনেক কম হয়। এ জন্যে সরকারি উদ্যোগে নানা ধরনের ও নানা আকারের শিল্প সংস্থার কারখানার জন্যে শিল্পতালুক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট স্থাপিত হয়েও চলেছে। যাঁদের শিল্পতালুকে জায়গা কিংবা শেড বা চালা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না, তাঁদের নিজেদের কারখানার জন্যে অন্য জমির কথা ভাবতে হবে। সেখানেও অনেক বিষয় ভাববার রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা

ক্রেতা সংরক্ষণ পর্ষৎ-এর প্রথম অধিবেশন

ভোগ্যপণ্যের উৎকর্ষ রক্ষা, ভেজাল প্রতিরোধ ও ন্যায্যমূল্যে পণ্যের নিয়মিত সরবরাহের জন্য শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগই যথেষ্ট নয়,সবার আগে চাই গণ-চেতনা। ক্রেতাদের এ ব্যাপারে জাগ্রত করতে না পারলে ঐ পর্যায়ের সব চেষ্টাই নিষ্ফল। ক্রেতা সংরক্ষণ পর্ষৎ-এর সভাপতি ও রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীনির্মল বসু বৃহস্পতিবার মহাকরণে ওই কথা বলেন। সংসদে গৃহীত ক্রেতা সংরক্ষণ বিষয়ে আইন অনুযায়ী এ রাজ্যে ৫১ জন সদস্য নিয়ে যে ক্রেতা সংরক্ষণ পর্ষৎ গঠন করা হয়েছে, সেই পর্ষৎ-এর প্রথম অধিবেশন বসেছিল ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে মহাকরণের রোটান্ডায়। রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী, যিনি ওই পর্ষৎ-এর চেয়ারম্যান, উদ্বোধনী ভাষণে আরও বলেন, আজকের সভায় সদস্যদের উপস্থিতির হার দেখেই অনুমেয়, ক্রেতা সংরক্ষণ পর্ষৎ-এর উদ্যোগ পরিস্থিতির উন্নতিতে নিশ্চিত প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে এ ব্যাপারে ষোল আনা ফল পেতে গেলে গণ-চেতনা বাড়ানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

এদিন পর্ষৎ-এর প্রথম অধিবেশনে বিভাগীয় সচিব শ্রীদীপক রুদ্র, বিশেষ সচিব শ্রীকমল নস্কর, অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য অধিকর্তা শ্রীমতী রানু ঘোষ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের একাধিক সচিব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের স্পেশ্যাল আই জি।

এদিন ক্রেতা সংরক্ষণ পর্ষৎ-এর অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী মৃণালিনী দাশগুপ্ত, গীতা বসু, ছায়া ঘোষ, বিদ্যা মুন্সী, অপরাজিতা গোপ্পী, বৃশি গিমি, শ্যামলী গুপ্ত, রেণুকা রায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত, প্রদীপ মেহতা ও প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সেচসূচিত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি

রাজ্যের বৃহৎ সেচের আওতাভুক্ত বড় বড় সেচ প্রকল্পের খাল দিয়ে সেচের জল জমিতে নিয়ে আসা হয় এবং কৃষিকাজে লাগানো হয়। বর্তমানে এই সকল ক্যানালের আউটলেট থেকে জমি ভাসিয়ে জলসেচ দেওয়া হয়। এতে জলের শুধু অপচয়ই হয় না, অনেক কম জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। এই কারণে সেচসূচিত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে যাতে দক্ষিণবঙ্গের কংসাবতী, দামোদর ও ময়ূরাক্ষী এই তিনটি বৃহৎ নদী প্রকল্পের সেচসূচিত এলাকায় সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে সেচের জলের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। সুষ্ঠু বন্টন হলেই জলের অপচয় বন্ধ হবে ও আরো অনেক বেশী জমি সেচের আওতায় আসবে। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাঠ-নালা তৈরি করা হচ্ছে যাতে ক্যানালের জল এই সব নির্দিষ্ট মাঠ-নালা দিয়ে চাষের জমিতে দ্রুত ও প্রয়োজনমত প্রবেশ করতে পারে। জমি ভাসিয়ে সেচ দেওয়ার পদ্ধতিতে যেখানে ১০০ একর সেচসূচিত এলাকার মধ্যে মাত্র ৫০ থেকে ৬০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব, সেখানে মাঠ-নালা তৈরি করার ফলে সেচ সূচিত ১০০ একর জমিতেই সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।বীরভূম, বাঁকুড়া ও র্ধমান জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলার সদর (উত্তর) ও ঘাটাল মহকুমায় মাঠ-নালা নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে। মাঠ-নালার নক্সা ও পরিকল্পনা দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অর্থাৎ সেচসূচিত এলাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করেন এবং মূলত গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই মাঠ-নালাগুলি কাটা হয়। যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত রাজী হচ্ছেন না, সেখানে ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এলাকার প্রকৃতি ও অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ মাঠ-নালা পাকা করা হচ্ছে। এই মাঠ-নালাগুলি সাধারণতঃ জমির আল বরাবর তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে মাঠ-নালা তৈরি হচ্ছে, সেখানে আরো অনেক এলাকা সেচের আওতায় আসছে। এই কর্মসূচির প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার রাজ্য সরকার বহন করছেন এবং সেচের জন্য কৃষকদের কোন কর দিতে হয়না। রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর আলোচনা করে ঠিক করেছেন যে, যেসব ব্রাঞ্চ ক্যানাল বা ডিস্ট্রিবিউটারির অধিকাংশ আউটলেটের এলাকায় মাঠ নালা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, জল ছাড়ার ব্যাপারে সেই অঞ্চল অগ্রাধিকার পাবে, খরার সময়েও যাতে সেখানে অন্তত দুটি ফসল চাষ করা সম্ভব হয়। সুতরাং আরো অনেক জমিতে সেচ দিতে হলে এবং সেচের জলের অপচয় বন্ধ করতে হলে জমি ভাসিয়ে সেচ দেওয়া যেমন বন্ধ করতে হবে তেমনি প্রতি আউটলেটে মাঠ নালা তৈরি করে সেচের জলের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত এবং কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের ন্যায় গ্রামস্তরে সকল সরকারী ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে চাষীরা এ কাজে উৎসাহিত হন।

রাজ্যে অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী সরবরাহে এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে তদারকি সেল

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী সরবরাহে এবং মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে জেলা শাসকদের নেতৃত্বে একটি 'তদারকি সেল' কর্মরত আছে। ওই তদারকি সেলের অন্যান্য সদস্যারা হলেন জেলার পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার। এই 'তদারকি সেল' ছাড়াও জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েতে সমিতির সঙ্গে যুক্ত খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি নিজ নিজ এলাকায় ভোগ্য পণ্য সামগ্রীর সুষ্ঠু সরবরাহের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদারকি কর্ম করেন। শহরাঞ্চলেও পৌরসভাগুলিতে খাদ্য'ও সরবরাহ সম্পর্কিত অনুরূপ স্থায়ী সমিতি রয়েছে। মহানগরী কলকাতার জন্যে যে তদারকি সেল গঠিত হয়েছে, তাতে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের বিশেষ সচিব, কলকাতার কালেকটার ও পুলিসের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডেপুটি কমিশনার রয়েছেন।

রাজ্য স্তরে যে 'তদারকি সেল' কাজ করেছেন তার সদস্যারা হলেন খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সচিব, সংভাগ অধিকর্তা, ডি.ডি.পি. এসের অধিকর্তা, ভোগ্য পণ্য অধিকর্তা, এবং পুলিসের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের স্পেশ্যাল ইন্সপেকটর জেনারেল।

অত্যাবশ্যক ভোগ্য পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে এইসব 'তদারকি সেল' গঠন ছাড়াও খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত আলাপ আলোচনা ক্রমে সমগ্র পরিস্থিতির ওপর তদারকি করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং জেলা বাদে অন্য সমস্ত জেলায় গ্রাম-পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত-সমিতি ও জেলা পরিষদগুলির নির্বাচনের দিন স্থির করেছেন। ঐদিন সকাল ৭ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে।

গ্রামীণ সংবাদ

ক্ষুদ্রসেচে প্রকল্পভিত্তিক আঞ্চলিক কমিটির ভূমিকা

সারা বৎসর ধরে কৃষিকাজ অব্যাহত রাখতে হলে ও একফসলী জমিকে দো-ফসলী বা তে-ফসলী করতে হলে ভূগর্ভস্থ ও নদী জলোত্তোলন প্রকল্পের জলের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। এই জন্য প্রতিটি গভীর নলকূপ ও নদী জলোত্তোলন প্রকল্পে একটি করে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়েছে স্থানীয় বিধায়ক বা তাঁর প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা তাঁর মনোনীত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোন সভ্যকে নিয়ে। কমিটির আহ্বায়ক এই কমিটির সভ্য কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক সহকারি কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক বা তাঁর মনোনীত কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক। ব্লকের সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার বা তাঁর তরফে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অপারেটর এই কমিটির সভ্য হিসাবে থাকবেন। প্রতিটি স্পাউটের কাছ থেকে অন্ততঃ পক্ষে একজন প্রতিনিধি, সবথেকে দূরের স্পাউটের থেকে কমপক্ষে তিনজন প্রতিনিধি থাকবেন যাদের মধ্যে দুইজন হবেন ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষী। অর্থাৎ গভীর নলকূপ ও নদী জলোত্তোলন প্রকল্পের সেচসৃচিত এলাকায় জমি কর্ষণকারী ৫ জন কৃষককে বেছে নিয়ে এই কমিটি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করবেন।

কমিটি তাঁদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সেচসৃচিত এলাকায় কতখানি জল পাওয়া যাবে এবং কিভাবে তা বন্টন করা হবে তার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারকে জানাবেন। জল বন্টনের সময় প্রধান লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রবি মরশুমে অপচয় না করে সর্বোচ্চ পরিমাণ জলের ব্যবহার সম্ভব হয়। সাধারণ সময়ে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তা না দিয়ে সংকটকালীন সেচব্যবস্থার মত জল দিতে হবে। অর্থাৎ ফসলের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে হবে। জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য পর্যায়ক্রমিক সেচ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পটি যেন অনেক বেশী সময় চালু থাকে এবং সেচব্যবস্থার যন্ত্রাংশ যাতে চুরি না হয়ে যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেচের জলের নিয়মিত সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য পাম্প-অপারেটরগণের উপস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি বা মেরামতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে। সেচের জলের সুষ্ঠু বন্টন ও নিয়মিত সরবরাহকে সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এই কমিটিকে।

প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল

খাস কলকাতা থেকে খুব একটা দূরে নয়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বেনাই অঞ্চল। গ্রামের নাম কৈজুড়ী। এই গ্রামের অধিবাসী শ্রীজয়দেব বেরা। পিতা প্রয়াত গুণধর বেরা। এঁর বাগানে নানান গাছগাছড়ার সঙ্গে চোখে পড়বে দুটি বিশেষ নারকেল গাছ, চোখে ধরবেই। কথায় আছে একটি বীজ থেকে একটি প্রাণ। এখানে একটি নারকেল থেকে দুটি চারা। পরবর্তীকালে ফলদায়িণী বৃক্ষ। অনেকেরই নজর কেড়েছে। আপনারও ভালো লাগবে। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র খেয়াল।

বাঁকুড়া জেলার নতুন সভাধিপতি নির্বাচন

শ্রীজ্ঞানশংকর মিত্র বাঁকুড়া জেলার নতুন সভাধিপতি হলেন। তিনি প্রয়াত সভাধিপতি দীনবন্ধু মহান্তির স্থলাভিষিক্ত হলেন। শ্রীমিত্রর বয়স ৪৫। ১৯৬৬ সালে তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। পেশায় শিক্ষক শ্রীমিত্র পূর্বে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ছিলেন।



বিচিত্র নারকেল গাছ

প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে

–শ্রীপ্রভাস ফদিকার

গত ২১.১১.৮৭ তারিখে বেলা ১০ টায় মালদায় রাজ্য মুরগী খামারের উদ্বোধন করা হয়। এই মুরগী খামারের উদ্বোধন করেন পশুপালন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশুপালন দপ্তর কর্তৃক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয় এই সেমিনারে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন ওল্ড মালদার বিধায়ক শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী ও বিশেষ অতিথির আসনে ছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র বিধায়ক। বিশেষ অতিথি শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে বলেন, মালদায় এই ধরনের খামারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের মুরগী খামার মুরগী চাষের ক্ষেত্রে অনেক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। গ্রামের বেকার ব্যক্তিগতভাবে এই খামারে প্রশিক্ষণ নেবেন এবং তার মাধ্যমে এর উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মুরগী চাষের যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌছে দিতে হবে। তাছাড়া তিনি নিজেও প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হন।

প্রধান অতিথি বিধায়ক শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী বলেন, মালদায় মুরগী চাষের সম্ভাবনা আছে। মুরগী চাষ আরো ব্যাপকভাবে প্রসার করতে হলে ভরতুকী মূল্যের মুরগী খাবার ও ওষুধপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে সাধারণ মুরগী চাষীদের মধ্যে, তবেই রোগ মুক্ত মুরগী পালনে চাষীরা সক্ষম হবেন।

সভাপতির ভাষণে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, আমরা সাধারণত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গো-পালন করেন থাকি। কিন্তু আজকের দিনে গতানুগতিক পদ্ধতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যুক্ত করা যেতে পারে। আজকের চাহিদার সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যেমন উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হচ্ছে তেমনি উচ্চমানের গরু বা মহিষ চাষ করার প্রয়োজন আছে। বিগত দিনগুলোতে মানুষ শুধু ব্যক্তিগত চাহিদা বা প্রয়োজনের তাগিদে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, মুরগী ইত্যাদি চাষ করত। নিজেদের খাদ্যে উপকরণও যোগাড় করত। কিছু আজকের দিনে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করেও অতিরিক্ত কিছু আশা করে যা জীবিকা বা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি বলেন পশুপালনের ক্ষেত্রে তিনটি লক্ষ্য পূরণ করা যেতে পারে–(১) পুষ্টিসাধন (২) জীবিকা সংস্থান (৩) অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ। এইরূপ খামারের মাধ্যমে এই সকল সুযোগ সুবিধা সাধারণ গ্রামের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রামের মানুষ যাঁ ব্যক্তিগত বা স্বীয় উদ্যোগে আসতে চায় তাদেরকে এই খামার ব্যবস্থার মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে। প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাণী সম্পদের মান উন্নয়ন করতে হবে। প্রাণী সম্পদ ও মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারণার সাথে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। সাধারণের প্রয়োজনে যদি মুরগী খামারকে লাগানো যায় তবেই খামার উদ্বোধনের সার্থকতা।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন–মুরগী চাষের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মীদের সহযোগিতামূলক মানসিকতার অভাব আছে। তিনি আরো সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

ঝাড়গ্রামে শহীদ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

"সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে যে যুথবদ্ধ সংগ্রাম আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেছে, শহীদ বিরসা মুন্ডার সংগ্রাম তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মুক্তির লক্ষ্যে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। সামগ্রিক ভাবেই শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তার লক্ষ্য। সে কারণেই বিরসা মুন্ডাকে আমরা জাতীয় বীর হিসাবে শ্রদ্ধা করি। শুধুমাত্র কোন সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে তাকে চিহ্নিত করা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক–বর্তমানে এই অঞ্চলের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই সত্যকে আমাদের আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে।"

–শহীদ বিরসা মুন্ডার ১১২তম জন্মজয়ন্তীতে ঝাড়গ্রাম ডি, এম, হলে এক মহতী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এই কথাগুলি বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে লোকসংস্কৃতির প্রসার ও বিকাশে ভারপ্রাপ্ত উপ অধিকর্তা শ্রীমাণিক সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শহীদ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৭ ঝাড়গ্রাম মহকুমার বেলপাহাড়ী, লালগড়, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, জাম্বনী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ধামসা মাদল সহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ঝাড়গ্রাম শহরে উপজাতি চর্চা কেন্দ্রের সমানে জমায়েত হ'ন এবং তাদেরকে নিয়ে বেলা ৩টার সময় শ্রীমাণিক সরকারের নেতৃত্বে, ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসক, জেলা ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুন্ডা সমাজের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগের সরকারি আধিকারিক ও বিশিষ্ট নাগরিকবর্গ এবং বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের একটি মিছিল উপজাতি চর্চা কেন্দ্র থেকে পথ পরিক্রমা করে ঝাড়গ্রাম দেবেন্দ্রমোহন হলের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আদিবাসী রমনীরা 'চুমাড়া' রীতিতে শহীদ বিরসার প্রতিকৃতি বরণ করেন এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। শ্রীহরি সিং ও সম্প্রদায়ের উদ্বোধনী সংগীতের পর সভাপতির ভাষণে মহকুমাশাসক শ্রীদীপক কুমার গৌতম সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির প্রতীক এ জাতীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে 'সামাজিক চেতনার বৃদ্ধিতে বিরসা মুন্ডার অবদান' এবং 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী জীবন' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন মুন্ডাসমাজ সুগাঢ় সমিতির সম্পাদক শ্রীকাঞ্চন সিং, মুন্ডা সমাজ গাঁরার নেতা শ্রীপরমানন্দ সিং, শ্রীবিজয় মান্ডি এবং শ্রীসুবোধ হাঁসদা, শ্রীনভেন্দু হোতা, শ্রীরনেন সেন, শ্রীশৈলজানন্দ হাঁসদা প্রমুখ। দীর্ঘ এই আলোচনাসভার শেষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীমদনমোহন দাস।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও দূর দূর অঞ্চল থেকে আগত বহু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংস্থা এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নৃত্যে–ডেংগাকৈমা দিরি বাহাদুর ক্লাব (গোপীবল্লভপুর), কাঁকড়াঝোড় উলি হলয় ক্লাব, তেলকেন্দ্রে বিরসা উড়ুঃ ক্লাব (সাঁকরাইল), মরাইখুচি মুন্ডা ক্লাব (ঝাড়গ্রাম), সংগীতে–বাণীভবনের ছাত্রী শ্রীমতী সীমা হেমব্রম, মিহির সিং ও পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মেমোরিয়াল ক্লাব এবং আবৃত্তিতে স্বভাবকবি শ্রীভবতোষ শতপথী, ঈশ্বরচন্দ্র সিং ও পরমানন্দ সিং। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে সরকারি অনুষ্ঠান রাত দশটায় শেষ হলেও আদিবাসী নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সারারাত্রিব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে

—শ্রীপ্রভাস ফদিকার

গত ২১.১১.৮৭ তারিখে বেলা ১০ টায় মালদায় রাজ্য মুরগী খামারের উদ্বোধন করা হয়। এই মুরগী খামারের উদ্বোধন করেন পশুপালন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশুপালন দপ্তর কর্তৃক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন ওল্ড মালদার বিধায়ক শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী ও বিশেষ অতিথির আসনে ছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র বিধায়ক। বিশেষ অতিথি শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে বলেন, মালদায় এই ধরনের খামারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের মুরগী খামার মুরগী চাষের ক্ষেত্রে অনেক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। গ্রামের বেকার ব্যক্তিগতভাবে এই খামারে প্রশিক্ষণ নেবেন এবং তার মাধ্যমে এর উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মুরগী চাষের যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। তাছাড়া তিনি নিজেও প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হন।

প্রধান অতিথি বিধায়ক শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী বলেন, মালদায় মুরগী চাষের সম্ভাবনা আছে। মুরগী চাষ আরো ব্যাপকভাবে প্রসার করতে হলে ভরতুকী মূল্যের মুরগী খাবার ও ওষুধপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে সাধারণ মুরগী চাষীদের মধ্যে, তবেই রোগ মুক্ত মুরগী পালনে চাষীরা সক্ষম হবেন।

সভাপতির ভাষণে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, আমরা সাধারণত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গো-পালন করেন থাকি। কিন্তু আজকের দিনে গতানুগতিক পদ্ধতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যুক্ত করা যেতে পারে। আজকের চাহিদার সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যেমন উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হচ্ছে তেমনি উচ্চমানের গরু বা মহিষ চাষ করার প্রয়োজন আছে। বিগত দিনগুলোতে মানুষ শুধু ব্যক্তিগত চাহিদা বা প্রয়োজনের তাগিদে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, মুরগী ইত্যাদি চাষ করত। নিজেদের খাদ্যে উপকরণও যোগাড় করত। কিছু আজকের দিনে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করেও অতিরিক্ত কিছু আশা করে যা জীবিকা বা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি বলেন পশুপালনের ক্ষেত্রে তিনটি লক্ষ্য পূরণ করা যেতে পারে—(১) পুষ্টিসাধন (২) জীবিকা সংস্থান (৩) অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ। এইরূপ খামারের মাধ্যমে এই সকল সুযোগ সুবিধা সাধারণ গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রামের মানুষ যাঁ ব্যক্তিগত বা স্বীয় উদ্যোগে আসতে চায় তাদেরকে এই খামার ব্যবস্থার মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে। প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাণী সম্পদের মান উন্নয়ন করতে হবে। প্রাণী সম্পদ ও মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারণার সাথে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। সাধারণের প্রয়োজনে যদি মুরগী খামারকে লাগানো যায় তবেই খামার উদ্বোধনের সার্থকতা।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন—মুরগী চাষের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মীদের সহযোগিতামূলক মানসিকতার অভাব আছে। তিনি আরো সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

ঝাড়গ্রামে শহীদ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

"সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে যে যূথবদ্ধ সংগ্রাম আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেছে, শহীদ বিরসা মুন্ডার সংগ্রাম তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মুক্তির লক্ষ্যে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। সামগ্রিক ভাবেই শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তার লক্ষ্য। সে কারণেই বিরসা মুন্ডাকে আমরা জাতীয় বীর হিসাবে শ্রদ্ধা করি। শুধুমাত্র কোন সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে তাকে চিহ্নিত করা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক—বর্তমানে এই অঞ্চলের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই সত্যকে আমাদের আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে।"

—শহীদ বিরসা মুন্ডার ১১২তম জন্মজয়ন্তীতে ঝাড়গ্রাম ডি, এম, হলে এক মহতী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এই কথাগুলি বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে লোকসংস্কৃতির প্রসার ও বিকাশে ভারপ্রাপ্ত উপ অধিকর্তা শ্রীমাণিক সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শহীদ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৭ ঝাড়গ্রাম মহকুমার বেলপাহাড়ী, লালগড়, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, জাম্বনী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ধামসা মাদল সহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ঝাড়গ্রাম শহরে উপজাতি চর্চা কেন্দ্রের সমানে জমায়েত হ'ন এবং তাদেরকে নিয়ে বেলা ৩টার সময় শ্রীমাণিক সরকারের নেতৃত্বে, ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসক, জেলা ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুন্ডা সমাজের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগের সরকারি আধিকারিক ও বিশিষ্ট নাগরিকবর্গ এবং বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের একটি মিছিল উপজাতি চর্চা কেন্দ্র থেকে পথ পরিক্রমা করে ঝাড়গ্রাম দেবেন্দ্রমোহন হলের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আদিবাসী রমনীরা 'চুমাড়া' রীতিতে শহীদ বিরসার প্রতিকৃতি বরণ করেন এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। শ্রীহরি সিং ও সম্প্রদায়ের উদ্বোধনী সংগীতের পর সভাপতির ভাষণে মহকুমাশাসক শ্রীদীপক কুমার গৌতম সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির প্রতীক এ জাতীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে 'সামাজিক চেতনার বৃদ্ধিতে বিরসা মুন্ডার অবদান' এবং 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী জীবন' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন মুন্ডাসমাজ সুগাড় সমিতির সম্পাদক শ্রীকাঞ্চন সিং, মুন্ডা সমাজ গাঁরার নেতা শ্রীপরমানন্দ সিং, শ্রীবিজয় মান্ডি এবং শ্রীসুবোধ হাঁসদা, শ্রীনভেন্দু হোতা, শ্রীরনেন সেন, শ্রীশৈলজানন্দ হাঁসদা প্রমুখ। দীর্ঘ এই আলোচনাসভার শেষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীমদনমোহন দাস।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও দূর দূর অঞ্চল থেকে আগত বহু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংস্থা এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নৃত্যে—ডেংগাকৈমা দিরি বাহাদুর ক্লাব (গোপীবল্লভপুর), কাঁকড়াঝোড় উলি হলয় ক্লাব, তেলকেন্দ্রে বিরসা উড়ুঃ ক্লাব (সাঁকরাইল), মরাইখুচি মুন্ডা ক্লাব (ঝাড়গ্রাম), সংগীতে—বাণীভবনের ছাত্রী শ্রীমতী সীমা হেমব্রম, মিহির সিং ও পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মেমোরিয়াল ক্লাব এবং আবৃত্তিতে স্বভাবকবি শ্রীভবতোষ শতপথী, ঈশ্বরচন্দ্র সিং ও পরমানন্দ সিং। প্রসংগত: উল্লেখ্য যে সরকারি অনুষ্ঠান রাত দশটায় শেষ হলেও আদিবাসী নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সারারাত্রিব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

পুস্তক পরিচয়

কত দীর্ঘ হলে মূল ঃ তৃপ্তি সান্ত্রা ঃ জোয়ার প্রকাশনী রামকৃষ্ণপল্লী, মালদহ। পরিবেশক ঃ গল্পগুচ্ছ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা–৯। আট টাকা।

গ্রন্থটির নাম থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠা অবধি সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে একটা কাব্যময়তা। ইঙ্গিতময়তা, বুদ্ধির দীপ্তি, শব্দচয়নের কুশলতা ইত্যাকার গুণাবলীর প্রায় সবটাই কবির আয়ত্তে। যদিও এটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবীর আমলে সমকালীন পুরুষ কবিদের তুলনায় মহিলা কবিদের কিছুটা সহানুভূতির চোখে দেখা হত। এদিক থেকে আজ কিন্তু যুগটা পুরো পাল্টে গেছে। নবনীতা দেব সেন, কেতকী কুশারী ডাইসন, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, সবিনা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁরা উঠে এসেছেন তাঁদের কলমের জোর যে কোন পুরুষ কবিকেই টেক্কা দিতে পারে। তৃপ্তি সান্ত্রা মহিলা কবি এবং সুদূর মফস্বল উত্তরবঙ্গের মানুষ। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকতার কোন ছাপ তাঁর কবিতার শরীরে ধরা পড়ে না।

> 'পশ্চিমবঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রে সমালোচনার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদির দু-কপি করে পাঠাতে হবে।
>
> সাময়িকপত্রের কেবল বিশেষ সংখ্যাই সমালোচিত হয়ে থাকে।

সাতান্নটি কবিতা নিয়ে এই গ্রন্থ। প্রকৃতি আর মানুষ এই দুটি তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। যন্ত্রণাক্লিষ্ট এই জটিল যুগসন্ধিক্ষণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা চেতনাকে কবি তাঁর গভীর রাজনৈতিক বোধে সিক্ত করে বাণীরূপ দিয়েছেন। 'মানুষ যদিও ভয়ে অনিশ্চয়তার দীন। তবু/দিনরাত মানুষেরই সচল হৃদয়/সর্বগ্রাসী চোখ। খিদে সর্বগ্রাসী।' (ইচ্ছের বাগান) অথবা 'মানুষকে হতে হয় তাই/সাগরের মত বিশাল হতে হবে/হতে হয় পৃথিবীর মত ধৈর্যশীল, রজনীগন্ধার/মত কৌমার্যে স্থির। (প্রভু, তুমি সংস্কারে শুধু) এইসব পংক্তিগুলি আমাদের ভাবায় এবং মাতায়। একটাই সহজ ছন্দের কবিতা, 'সুখের চাবি'। অবশ্য এইরকম কবিতাই আমরা এখন চাই, আমাদের ইদানীংকালের কাব্যভান্ডারে এ ধরনের ভাল কবিতার বড় আকাল। প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, অলংকরণ এবং অন্তর্নিহিত সম্পদ সবকিছু মিলিয়ে কাব্যগ্রন্থটি মনোরম, সুন্দর। কামনা করি, এই নবীনা কবির কাব্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ হোক।

শ্যামল মৈত্র

দ্বন্দ্ব ঃ শারদ সংকলন '৮৭ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসংঘ চাঁপদানী-ভদ্রেশ্বর প্রস্তুতি কমিটি প্রকাশিত। মূল্য–তিন টাকা।

পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–"ধনতন্ত্রের সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাবাহী অতিকুট দুর্নীতি পরায়ণ ও অযোগ্য রাষ্ট্রকাঠামোর যে সব অসুবিধে সমস্ত দেশবাসীকে ভোগ করতে হচ্ছে, আমরা তারই মধ্যে দৃঢ় এক প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছি এবং যে অন্ধকার চতুর্দিক থেকে আমাদের সামজকে গ্রাস করতে উদ্যত তারই বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ আমাদের।"–ঘোষণার এই দায়বদ্ধতা 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নক্সার মধ্যে যথার্থ তাৎপর্যময়ভাবে সুস্পষ্ট। বর্তমানকালের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার যে সামাজিক দায়িত্ব লেখক শিল্পীদের পালন করা প্রয়োজন 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার লেখক-সমালোচকরা একথা কখনও ভুলে যাননি। তাই ভাবনার ক্ষেত্রে একটা সমাজ মনস্কতা ও ঘটনার বর্ণনায় ও রূপকল্পনায় রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক বস্তুবাদী আন্তরিক বিশ্লেষণী প্রবণতা যা পাঠক সাধারণকে আত্মঅন্বেষার সুযোগ করে তোলে–আত্মসচেতনও। এ প্রসঙ্গে পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধ 'শ্রম চঞ্চল চাঁপদানীর চালচিত্র' সমীক্ষাধর্মী এই প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে–যার মধ্যে চাঁপদানীর জীবন-জীবীকা, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক প্রতিবেশে গড়া সামগ্রিক জীবন ভাবনার এক তথ্যধর্মী চালচিত্র পাওয়া যায়। 'সন্ধান করি তাজা রক্তের' দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিধিতে বিস্তৃত এই লেখার উপজীব্য মানব কল্যাণে সংগ্রামী মানুষের সংগঠিত লড়াই সংগ্রামের পটভূমিতে সংগঠন গড়ে তোলার ইতিহাস অন্বেষা এবং আজকের পটভূমিতে আমাদের করণীয় কি তারই গতিনির্দেশ প্রদান। এ ছাড়া "গ্রামের পঞ্চায়েত ও শহুরে ভদ্রলোকদের নেলসনের অন্ধচোখ" সাম্প্রতিক কালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষকে যে আত্মমর্যাদার অধিকার দিয়েছে যা পরজীবী শহুরে মানুষের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না–তারই তির্যক বিশ্লেষণ। 'কবিতার বর্তমান ও ভবিষ্যত' প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান কবিতা সম্পর্কীয় আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। রাস্তার ধাঁধা, ওভারড্রাফ্ট, রক্ত বনাম রক্ত, ইত্যাদি গল্পগুলি স্বাদে ভিন্নধর্মী হলেও সমাজ বাস্তবতার অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকটের চরিত্র যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। কবিতাগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে জীবন সংগ্রামের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও আধুনিক কালের পটভূমিতে হৃদয়বৃত্তির অন্তরঙ্গ জয় পরাজয়ের রূপক ব্যঞ্জনা। সব দিক থেকে বিচার করে বলা যায় 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকা সাহিত্য মর্যাদায় ও রুচিশীল জীবন ভাবনায় একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর অনন্য পত্রিকা।

রা–পত্রিকা

শারদীয় বিশেষ সংখ্যা ১৬৬ বিধান পার্ক, বরানগর, কলিকাতা ৭০০০৯০ সম্পাদক ঋতীশ চক্রবর্তী। দাম ঃ চার টাকা

মানুষ জাগছে। জীবন কথা বলছে। প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে।......সারা দেশের মানুষ চেতনার বিকৃতিকে চিনতে পেরেছে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে উল্লিখিত এই দাবি–সম্পাদকের সাহিত্যিক আশাবাদে সমর্থণযোগ্য হলেও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে কতখানি সমর্থণযোগ্য ভাবার জন্যে অনুরোধ রেখেই 'রা' পত্রিকার মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হলাম। কারণ, আমাদের দেশে–প্রগতি আন্দোলনের সব ধারাই অনেকেই প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। তবু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের তেমন কোন পরিবর্তন তো হয়ইনি বরং তা বেড়েছে। স্বাধীনতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হচ্ছে–সে তুলনায় সত্যিকারের সংগ্রাম আন্দোলনের সঠিক পথ অন্বেষার সঙ্গতি থাকছে না। নানা রকম ডান বাম এবং প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ তাকে বিপথগামী বিভ্রান্ত করে চলেছে। যার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে উন্মেষিত চেতনার ভারসাম্যহীনতা ও অনৈক্য থেকেই যাচ্ছে না।

প্রবীণ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের দ্বন্দ্ব কবিতায়–এখন চতুর্দিকে শুধুই প্রশ্ন/যেন কেউ অনবরতই তীর ছুড়ছে আড়াল থেকে/যে কোন সময় তীক্ষ্ণ শায়ক বিদ্ধ করবে বুক। সমাপ্তিতে–যদি দুজনেই এগিয়ে যেতে পারি,/এদিক থেকে আমি ওদিক থেকে তুমি,/যেন তুমি আমার হৃদয়কে ছুঁতে পারছ, আমি তোমাকে–/তা হলে একদিন পৌঁছবই দ্বন্দ্ব থেকে দ্বন্দ্বহীনতায়।–এ শুধু দ্বৈত জীবন দ্বন্দ্বের অনুভূতি নয় -সর্বব্যাপক জীবন ভাবনার সামগ্রিক পটভূমিতেও এর তাৎপর্য বিস্তৃত। শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রূপক ব্যাঞ্জনাধর্মী বাঘের গোঁ, কবিতায়ও কবি দেশ কালের অন্তর চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চেতনার আত্মমুখীনতার সমৃদ্ধ সুন্দর চিত্রধর্মী কবিতা অংশু শূরের 'পুড়ে যাচ্ছে মায়া'।

এ ছাড়া রা পত্রিকার এই সংকলনটিতে বেশ কিছু সুনির্বাচিত কবিতার মধ্যে সন্তোষ দাসের স্মারণ, নিমাই মান্নার–কওনকোড়ের পাকদন্ডী পথে, অশোক অধিকারীর 'ভাতকাপড়'–ইত্যাদি উল্লেখ্য। কবিতার তুলনায় গল্পগুলি কিছুটা

(শেষাংশ ৪৯৬ পৃষ্ঠায়)

বিবিধ সংবাদ

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান অয়েল ডিলারস ফোরামের আয়োজিত সংগীত সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরাঘবন মুখ্যমন্ত্রির ত্রান তহবিলে পঞ্চাশ হাজার এক টাকার চেক ও বেশ কিছু ঔষধ প্রদান করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূরের হাতে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী ঐ সভায় অনুরোধ করেন গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ যাতে বেশী পরিমানে তেল পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অয়েল কর্পোরেশন যেন উদ্যোগ নেয়।

পরে ঐ সংস্থারই সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার (ক্যালকাটা ডিভিশান) শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধে এবার রাজ্যবাসীর অভাবের অবস্থা আমরা ভীষণভাবে উপলব্ধি করছি এবং আমাদের সংস্থার ঐকান্তিক চেষ্টা থাকবে যাতে কেরোসিনের অভাব দূর করা যায়।

ঐ অনুষ্ঠানের শেষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় শ্রীদীপক রুদ্র, শ্রীঅরিন্দম গাঙ্গুলী এবং শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রৌঢ় দুই বাদক পন্ডিত ভি জি যোগ (বেহালা) ও ভি বালসারা(পিয়ানো) এবং তবলায় সাবির খান অংশগ্রহন করেন।

পুনরায় টোনড্ মিল্ক সরবরাহ

আগামী ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ থেকে টোনড্ মিল্কের উৎপাদন ও সরবরাহ পুনরায় শুরু হচ্ছে। বিগত ১১.৯.৮৭ থেকে টোনড মিল্কের উৎপাদন ও সরবরাহ স্থগিত ছিল। যাঁদের দুধের কার্ড আছে এবং টোনড্ মিল্কের অন্যান্য ক্রেতারা যাঁদের ২ ডিসেম্বর ১৯৮৭ থেকে আগাম টাকা জমা দেবার কথা তাঁদের নির্দিষ্ট দুধের ডিপো এবং ক্যাশ অফিসে যেখানে সুবিধে, টোনড্ মিল্কের দাম জমা দিতে হবে।

১৯৮৭-র অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দুধ সরবরাহ না হওয়া, ঘাটতি যোগান দুধ নষ্ট হওয়া, দুধ পড়ে যাওয়া ইত্যাদির দরুন যে টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা, তা ১৯৮৭-র ডিসেম্বর ও ১৯৮৮-র জানুয়ারি মাসে টোনড্ মিল্কের কার্ড পুনর্নবীকরণের সময় দুধের হিসেবের সংগে যথারীতি ঠিক করে দেওয়া হবে।

বন্যাবিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার বাবদ অনুদান

পশ্চিমবঙ্গের দশটি বন্যাক্রান্ত জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার এবং আসবাব ক্রয় ইত্যাদি বাবদ রাজ্য সরকার চল্লিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ দশ হাজার টাকার বেশি হবে না। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণ বাবদ খরচের অঙ্ক চল্লিশ হাজার টাকার বেশি হবে না। সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল বোর্ড জিলা পরিষদ সংস্কার এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের দায়িত্ব নেবেন।

সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে রাস্তা নির্মাণের জন্য মঞ্জুরি

রাজ্য সরকার আই. এফ. এ. ডি'র সহায়তাপ্রাপ্ত সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে মথুরাপুর ব্লকের রায়দীঘি হাট থেকে নাপতি মোড় পর্যন্ত বি. পি. রোড নির্মাণ পরিকল্পের কার্য নির্বাহের জন্য ৫,৪৫,৪৯৯ টাকা মঞ্জুর করেছেন। সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে পরিকাঠামো বিভাগের নির্বাহি বাস্তুকার এই পরিকল্পের কাজ রূপায়িত করবেন।



ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরাঘবন স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূরের হাতে ৫০,০০০ টাকার একটি চেক তুলে দিচ্ছেন।

ছবি : দেবাশিস ভদ্রের সৌজন্যে

ক্যানসার সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ক্যানসার সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল শিলিগুড়ির সিনক্লেয়ার্স হোটেলে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সঙ্গে এই ক্যানসার সোসাইটির একযোগে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে এর ফলে বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারবেন। গ্রামে বসবাসকারী জনগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এ রাজ্যে ৭৬৬৫টি সাব হেল্প সেন্টার রয়েছে। এছাড়া আরো ৩ হাজার সেন্টার এ বছর খোলা হবে।

তিনি বলেন যে এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে যথার্থ কল্যাণকামী ডাক্তারদের সহায়তা প্রয়োজন। ডাক্তাররা যে গ্রামে যেতে চান না সে কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বিভিন্ন হেল্থ সেন্টারে এখনো ৬০০ ডাক্তারের পদ খালি রয়ে গেছে। গ্রামে বসবাসকারী জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি ডাক্তারদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ ক্যানসার সোসাইটির সভাপতি ডাঃ কে.কে. চ্যাটার্জী তাঁর ভাষণে অভিযোগ করে বলেন যে শুধুমাত্র সিগারেটের প্যাকেটে সাবধান বাণী লেখা, অন্য কোনো সাবধানতার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

বিশেষ অতিথির ভাষণে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীদীপ্তিভূষণ দত্ত সকল শ্রেণীর মানুষকে, বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।

একতা সপ্তাহ পালন

গত ২৩ নভেম্বর ৮৭, মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে রাষ্ট্রীয় একতা সপ্তাহে সাংস্কৃতিক সংহতি দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল। বহরমপুর শাখা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গণসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীউৎপল ঝা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতির ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন শ্রীপুলকেন্দু সিংহ, সদস্য রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদ, শ্রীমুজাফফার হোসেন, সদস্য রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদ, ঋত্বিক নাট্য গোষ্ঠীর পক্ষে শ্রীগৌতম রায়চৌধুরী, প্রান্তিক নাট্য গোষ্ঠির শ্রীঅসিত রায়, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পক্ষে শ্রীসুধীন সেন। আলোচনায় শ্রীপুলকেন্দু সিংহ বলেন, আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি মানুষকে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানায়, বর্তমানে কিছু বিরুদ্ধবাদী শক্তি ভারতবর্ষের সুস্থ সংস্কৃতিকে নষ্ট করছে। সংস্কৃতি কর্মীদের দেশের ঐক্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে বলে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শ্রীস্বপন রায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। শ্রীদ্বিজপদ হালদার ও শ্রীজালাম সেখ ও তাঁদের সম্প্রদায় জাতীয় সংহতি বিষয়ক কবিগান পরিবেশন করেন।

ঝাড়গ্রামে শিশুদিবস উদ্‌যাপন

পন্ডিত জহরলাল নেহরুর জন্মদিনে গত ১৪ নভেম্বর, '৮৭ ঝাড়গ্রামে বিকাশভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে সাড়ম্বরে শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিকাশভারতী অনাথ আশ্রমের শিশুরা বর্ষাবাদল উপেক্ষা করে সকাল ৭টায় প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করে। মূল অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সকাল ৯টায় দেবাশিস রায়চৌধুরীর (বয়স পাঁচ) নেতৃত্বে তিনজনের একটি সভাপতিমন্ডলী গঠিত হয়, অপর দু'জন ছিলেন রাজা সব্যসাচী সাহা (বয়স-নয়) এবং এম, রমেশকুমার (বয়স-ছয়)। পন্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এদিনের প্রধান অতিথি, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক।

বিকাশভারতী আনন্দ নিকেতনের ছাত্রবৃন্দের পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীত, অনাথ আশ্রমের শিশুদের পি.টি. ও প্যারেড, শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে ছড়া প্রতিযোগিতা-অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণকে উৎসব মুখর করে তোলে। অধ্যক্ষের পরিচালনায় ছাত্রদের রবীন্দ্রসংগীত ও রাগপ্রধান গানের অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। বিভিন্ন বয়সের ২৫জন শিশুর অংশগ্রহণে এদিনের সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল সুকুমার রায়ের ছড়া অবলম্বনে একটি ছড়া নাটিকা-'ছড়ার দেশে'।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে ছড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কারসহ গ্রামের কয়েকটি গরীব শিশুকে জামাকাপড় ও মিষ্টান্ন বিতরণ করে প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীসুকান্ত রায় বলেন, শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ বিষয়ে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও সজাগ দৃষ্টির কথা ব্যক্ত করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের নেপথ্য সংগঠক ও বিকাশ ভারতী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রীতাপস চক্রবর্তীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

জাতীয় সংহতি দিবস উদ্‌যাপন

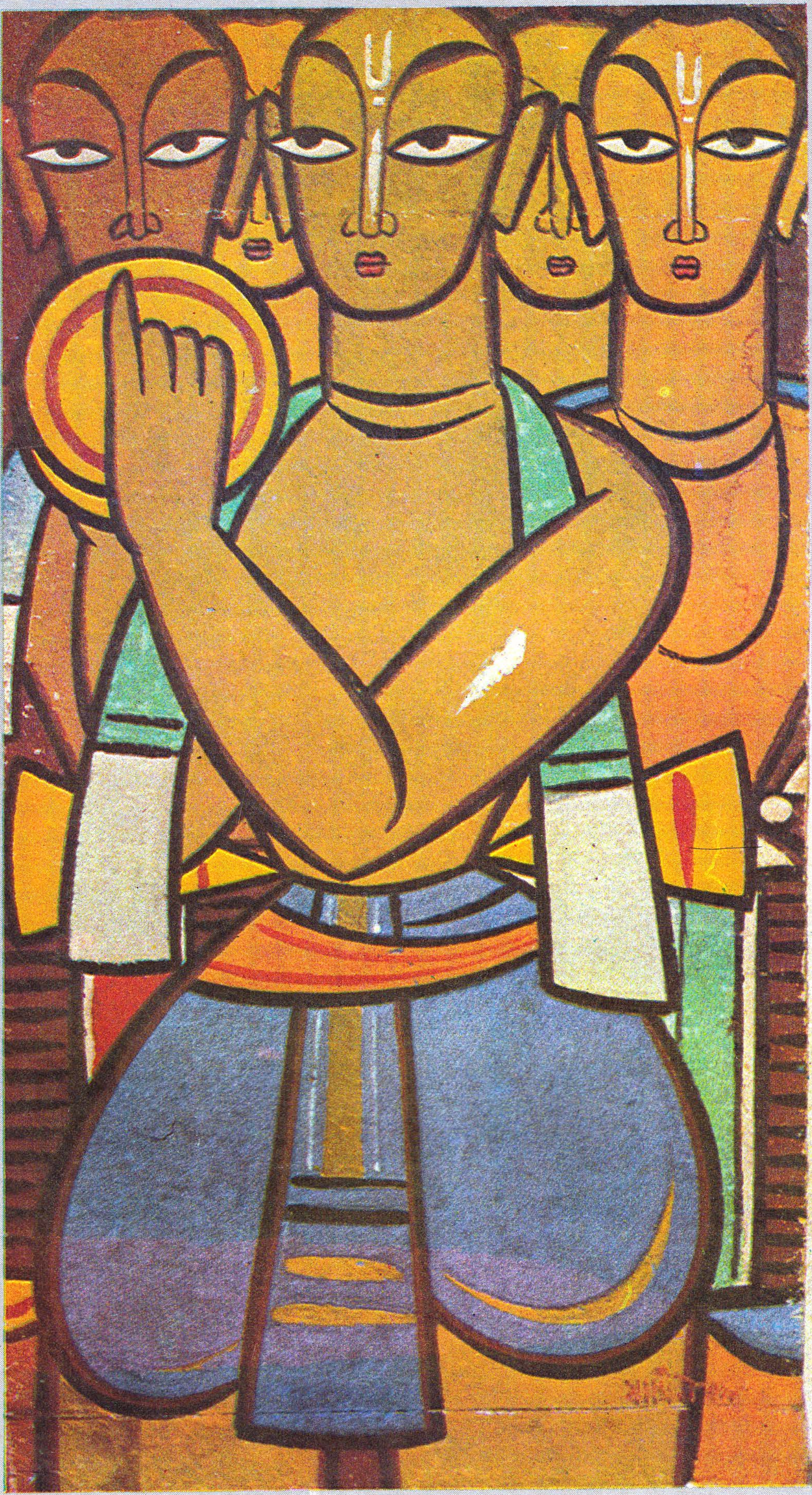
জঙ্গীপুর প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৭ "রাষ্ট্রীয় একতা সপ্তাহের" প্রথম দিনটি জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে "জাতীয় সংহতি দিবস" হিসাবে পালিত হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় সংহতির উপর বক্তব্য রাখেন—মহঃ আবু সাহেব, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক,-রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক, শ্রীমতী সুষমা চন্দ-শিক্ষিকা রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীসুবোধ দাস শিক্ষক, শ্রীকান্ত বাটী উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীকুনাল রায়,-যুব কল্যাণ আধিকারিক, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

● **পুস্তক পরিচয়**

৪৯৪ পৃষ্ঠার পর

দুর্বল-তবে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ও ভিন্নস্বাদে মোটামুটি আকর্ষণীয়। ভাষায় যা ব্যক্ত করা যায় না সুরে তা মূর্ত হয়ে ওঠে, সংঘাতের এই বিশেষ ক্ষমতা মানুষকে আকর্ষণ করে মুগ্ধ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী করে-এ সত্যের মূল্যায়ন শেখর চক্রবর্তীর প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র চেতনায় বাউলের সুর'। প্রবীন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্তের নজরুল গীতিতে স্বদেশ চেতনা এবং বিপ্লবী প্রেরণা-কবি ও সংগীতকার নজরুল ইসলামের মানব কল্যাণে জীবন ভাবনার ও প্রগতি চেতনায় উদ্বেলিত প্রেণার যথার্থ মূল্যায়ন। সর্বোপরি পত্রিকার মর্যাদাও আকর্ষণ বৃদ্ধিতে কিশোর বন্ধুর কিশোর মেলা সত্যি একটি সুন্দর পরিকল্পনা যা শিশু মনের নানান বিকাশের উপকরণ ও ভাবনার খোরাক যোগবে-এই সংকলনেও তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। শিশুদের নিয়ে বিশেষ বিভাগ ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যাবেন বলেই আশা রাখি।

মুকুলেশ বিশ্বাস



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীন পার্ক কলিকাতা ৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত।